চিল্ড্রেন'স এডুকেশন সিরিজ (৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

Book-12

ছোটদের সাহাবীদের জীবনী

[রাদিআল্লাহু আনহুম]

আমির জামান
নাজমা জামান

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মন্তব্য/পরামর্শ	আমির জামান/নাজমা জামান টরন্টো, ক্যানাডা info@themessagecanada.com
১ম প্রকাশ	মে ২০১৩
২য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৬
৩য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৮
সার্বিক সহযোগিতায়	রোকসানা পারভীন (রুমা) জেনিফা তাহ্‌রীম (উপমা)
ভাষা সহযোগিতায়	প্রমি, রজিত, তন্নী
প্রচ্ছদ সহযোগিতায়	জারা, রামিসা, জুমানা
© কপিরাইট	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট
প্রাপ্তিস্থান	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৭১০২১৯৩১০, ০১৬৮২৭১১২০৬ আল মারুফ পাবলিকেশনস কাটাবন মসজিদ, ঢাকা ০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১ কবির পাবলিশার্স চট্টগ্রাম ০১৬১৩০৬১৬৫৩
মূল্য	প্রতিটি বই ১০০ টাকা (Fixed price) ১২টি বইয়ের সম্পূর্ণ সেট ১২০০ টাকা (Fixed price)

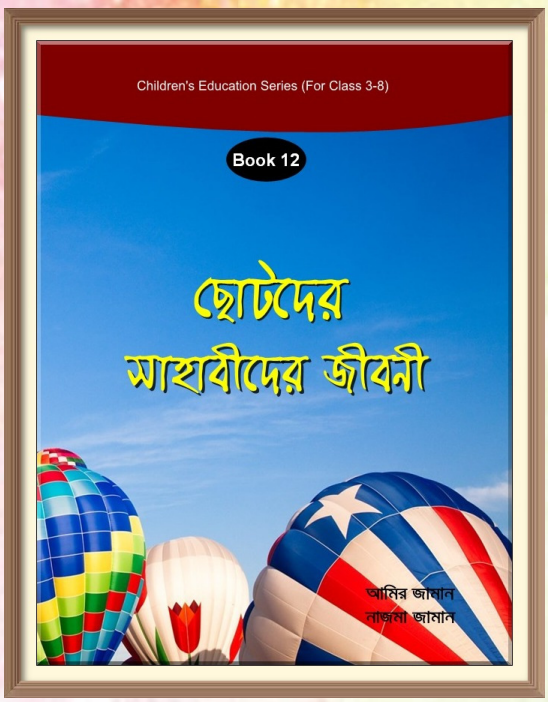

অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন

আমরা অভিভাবক এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারা যখন আমাদের বাচ্চাদের ইসলামিক সায়েন্স সিরিজের বইগুলো পড়াবো তখন নিম্নের কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। এতে আমাদের সন্তানরা আরো বেশী উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

১) আমরা অভিভাবকরা যদি রুটিন করে এই সিরিজের ১২টি বই আমাদের সন্তানদের নিজ ঘরে নিজ তত্ত্বাবধানে পড়াই তাহলে সে দুই বছরের মধ্যে ইসলামিক সায়েন্সের উপর পূর্ণাঙ্গ নলেজ নিয়ে গড়ে উঠবে এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

২) সন্তানদের পড়ানোর আগে নিজে পুরো বইটি আগাগোড়া পড়ে নিবো। সন্তানদের যেন কোন বিষয়ে গোজামিল দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা না করি। প্রতিটি বিষয়ের সাথে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি। তারা যেন প্রতিটি বিষয় আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে।

৩) প্রতিটি বিষয়ে রসূল ﷺ-কে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। রসূল ﷺ-এর জীবনী এবং সাহাবা (রা.)-দের জীবনী পড়ার পাশাপাশি রসূল ﷺ-এর জীবনীর উপর তৈরী মুভি এবং কার্টুন-এর ভিডিও দেখতে পারি। প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত রসূল ﷺ-এর জীবনী "আর-রাহীকুল মাখতুম" বইটি পড়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া।

৪) রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতে বলেছেন তা সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। এই সিরিজের সলাত শিক্ষার বইটিতে সলাতের প্রতিটি স্টেপ সহীহ হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। সহীহভাবে সলাত আদায়ের ভিডিও ও লেকচার ইউটিউবে পাওয়া যায়, তা দেখে আমরা সলাতটি ঠিক করে নিতে পারি। আমরা বড়রা যখন সলাত আদায় করি তখন যেন সন্তানদের সাথে নিয়ে আদায় করি এবং তাদেরকে সবসময় মসজিদে নিয়ে যাই হোক সে ছেলে বা মেয়ে। কাতারে নিজের পাশে দাঁড় করাই এবং তাদেরকে যেন পিছনে ঠেলে না দেই।

৫) ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে সদাকার অভ্যাস করানো উচিত। দেশের অসহায়-দরিদ্র এবং গরীব আত্মীয়দের সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া উচিত।

৬) ইসলামী আদব শিক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা পড়ার পাশাপাশি ঐ মুহূর্ত থেকেই প্রাকটিক্যাল করে থাকে। ইসলামী আদব বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত আদবগুলো সন্তানরা ঠিক মতো প্রয়োগ করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখি। প্রথম প্রথম সে হয়তো ভুলে যেতে পারে তৎক্ষণাৎ তাকে আদবের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তুমি সালাম দিতে ভুলে গেছ বা ঐ দু'আটা বলতে ভুলে গেছ ইত্যাদি, এমনভাবে বলা যাবে না যে সে অপমান বোধ করে। তবে একটি বিষয় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা তাদেরকে যা শিখানোর চেষ্টা করছি তা যেন আমরা নিজেরাও ঠিক মতো পালন করি তা না হলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বও তাদের কাছে কমে যাবে।

৭) নিজ বাসায় সন্তানদের জন্য একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এছাড়া IFD প্রকাশিত "প্যারেন্টিং" এবং "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে সফলতা অর্জন করবে" এই বই দু'টি যোগাড় করে অবশ্যই প্রতিটি অভিভাবকের পড়ে নেয়া উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

সূচীপত্র

আবূ বাকর সিদ্দিক (রা.)	৫
উমর বিন খাত্তাব (রা.)	৯
উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)	১৩
আলী বিন আবু তালিব (রা.)	১৫
উম্মুল মু'মিনিন খাদিজাতুল কুবরা (রা.)	১৭
উম্মুল মু'মিনিন সাওদা (রা.)	১৯
উম্মুল মু'মিনিন আয়িশা সিদ্দিকাহ (রা.)	২০
উম্মুল মু'মিনিন হাফসা বিনতে উমর (রা.)	২৩
ফাতিমাতুজ জাহরা (রা.)	২৪
আবু হুরাইরা আদ দাওসী (রা.)	২৮
বিলাল ইবন রাবাহ (রা.)	২৯
খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা.)	৩১
আম্মার ইবন ইয়াসির (রা.)	৩৩
আবু যার আল গিফারী (রা.)	৩৫
মুয়াব্বিজ ও মুয়াজ (রা.)	৩৮
খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)	৩৯

(রা.) = রাদিআল্লাহু আনহু বা আনহা

এই বইয়ে ব্রাকেটের মধ্যে সাহাবীদের নামের পাশে সংক্ষিপ্ত শব্দ (রা.) ব্যবহার করা হয়েছে। এটি দু'আর সংক্ষিপ্ত রূপ যার অর্থ "আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন"। পুরুষ সাহবী হলে 'আনহু' এবং মহিলা সাহাবী হলে 'আনহা'।

আবূ বাকর সিদ্দিক

(রাদিআল্লাহু আনহু)

বংশ পরিচয় ঃ তাঁর উপনাম ছিল আবূ বাকর। যখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন, তখন তাঁর উপাধি প্রদান করা হয় "সিদ্দিক"। তাঁর পিতার নাম 'উসমান ও মাতার নাম সালামাহ।

ইসলাম গ্রহণ ঃ রসূল ﷺ -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম দিনই আবূ বাকর (রা.) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রসূল ﷺ -এর সঙ্গে সর্বপ্রথম সলাত আদায় করেন।

ইসলামের সেবা ঃ আবূ বাকর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পরপরই ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বহু মহলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান জানান। আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে মক্কার জনসাধারণের সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল ছিল। তাঁর দাওয়াতে 'উসমান গনী (রা.) যুবাইর বিন আওম, 'আবদুর রহমান বিন আওফ, ত্বলহা বিন উবায়দুল্লাহ, সায়াদ বিন আবূ আক্কাস প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন।

একদা রসূল ﷺ কাবা ঘরে সলাতে সিজদা রত অবস্থায় ছিলেন। এমন অবস্থায় উকবাহ বিন আবূ মুইত তার চাদর রসূল ﷺ -এর গলায় পেঁচিয়ে ধরে সজোরে টানা-হেঁচড়া করে। তবুও রসূল ﷺ একাগ্রতার সাথে তাসবীহ পাঠ করতে ছিলেন। এমনি সময়ে আবূ বাকর (রা.) এসে উকবাহকে ধাক্কা দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে পড়তে সরিয়ে দিলেন–

হে নিষ্ঠুরেরা তোমরা কি এমন মানুষটিকে হত্যা করবে, যিনি বলেন, আমার প্রভু এক আল্লাহ। অথচ তিনিতো তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রকাশ্য দলীল প্রমাণ নিয়ে এসেছেন। এবার আবূ বাকর (রা.)-কে কতকগুলি দুষ্টলোক খুব প্রহার করল। তাঁর লম্বা চুল ধরে টানাটানি করল। এরূপ ন্যাক্কারজনক অপমান হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা।

হিজরত ঃ নবুয়তের ত্রয়োদশ সালের ২৭শে সফর রসূল ﷺ হিজরত করেন। আবূ বাকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র মক্কাহ হতে দক্ষিণ পার্শ্বে সওর পাহাড়ের দিকে রওনা হন। রাস্তা কঙ্করময় থাকার ফলে আবূ বাকর (রা.) রসূল ﷺ -কে তার কাঁধে তুলে নেন যেন, রসূল ﷺ -এর পা রক্তাক্ত না হয়। শেষ পর্যন্ত একটি গুহার নিকট পৌঁছে আবু বাকর (রা.) রসূল ﷺ -কে বাহিরে রেখে নিজেই ভিতরে প্রবেশ করে গুহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। আবূ বাকর (রা.) তার নিজের পরনের কাপড় টুকরো টুকরো করে গুহার সমস্ত ছিদ্রগুলি বন্ধ করার পর রসূল ﷺ -কে ভিতরে আসার জন্য অনুরোধ করেন। রসূল ﷺ এবং আবূ বাকর (রা.) উক্ত গুহায় তিন দিন অতিবাহিত করেন।

বদর যুদ্ধ ঃ বদর যুদ্ধে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন প্রধান সেনাপতি। রসূলের দেহরক্ষীর দায়িত্বে তিনিই নিয়োজিত ছিলেন। অষ্টম হিজরীর রমাদান মাসেই মক্কাহ বিজয় হয়। ঐ বৎসরই আবূ বাকর (রা.)-এর পিতা আবূ কুহাফা ইসলাম গ্রহণ করেন। নবম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি কালে সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যে রসূল ﷺ ব্যাপকভাবে চাঁদা ধরেন। আবূ বাকর (রা.) তার ঘরের সমস্ত ধন-সম্পদ রসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করেন- যা ছিল মূল্যের দিক দিয়ে অতি নগণ্য। তাবুক যুদ্ধ ছিল সেকালের প্রতাপশালী রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে। অন্য কোন যুদ্ধে এত অধিক সংখ্যক মুসলিম সেনার সমাবেশ করা হয়নি। এই যুদ্ধ ছিল রসূল ﷺ -এর যুগের সর্বশেষ

ও সর্ববৃহত্তম যুদ্ধ। এই যুদ্ধেও আবূ বাকর (রা.) সেনাপতিত্ব করেন। নবম হিজরীতে হাজ্জ ফরজ করা হয় এবং তাকেই রসূল ﷺ হাজ্জের আমীর নির্বাচিত করেন।

শেষদিন ঃ রসূল ﷺ ইন্তিকালের দিন ফজরের সলাত আবূ বাকর (রা.)-এর সঙ্গে একত্রে পড়েন। রসূল ﷺ-এর ইন্তিকালে সাহাবাগণের হৃদয়ে খুবই কষ্ট অনুভব করলেন। এমনকি 'উমার (রা.)-ও রসূল ﷺ-এর ইন্তিকালকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারছিলেন না। রসূল ﷺ -এর ইন্তিকালের সংবাদ শুনে আবূ বাকর (রা.) ঘরে প্রবেশ করে মুখমণ্ডল হতে চাদর সরিয়ে কপালে চুমু দিয়ে বলেন, আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হোক! আপনার জন্য যে মৃত্যু অবধারিত ছিল তা আজ ঘটে গেছে। আল্লাহ আপনাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যুদান করবেন না। এবার চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে বাহিরে এসে জনতার মাঝে দাঁড়ালেন; বললেন, যারা মুহাম্মাদ ﷺ -এর পূজা করত তারা জানুক তিনি মারা গেছেন আর যারা আল্লাহর উপাসক তাদের জানা দরকার– আল্লাহ অমর, অবিনশ্বর। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী- মুহাম্মাদ ﷺ একজন রসূল মাত্র আর কিছুই নন, তার পূর্বেও বহু রসূল মারা গেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করতে পারেন, নিহত হতে পারেন, তাই বলে কি তোমরা পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাবে? যে ব্যক্তি ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কৃত করবেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হওয়ার কিছু সময় পরেই মদীনার আনসাররা সমবেত হয়ে তাদের মধ্য হতে খলীফা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঠিক সেই মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.), 'উমার (রা.) ও আবূ উবায়দাহ (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে মদীনাবাসীদের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানান। এক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। উত্তেজিত জনতাকে বাদানুবাদ ও যুক্তি-তর্ক রত অবস্থা হতে মুক্ত করেন। উপস্থিত জনমণ্ডলি আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। পরের দিন জনগণ ব্যাপকভাবে বাইয়াত গ্রহণ করেন। আবূ বাকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আপনাদের সমর্থনে পরিচালক নিযুক্ত হয়েছি, তাই বলে কিন্তু আমি আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। আমি সৎপথে থাকলে আপনারা আমার প্রতি সাহায্য যোগাবেন, বিপথগামী হলে পরিত্যাগ করবেন। সত্য বলা আমানত, মিথ্যা বলা খিয়ানত, আপনার দৃষ্টিতে যে দুর্বল আমার নিকট সেই সবল ঐ সময় পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তার লুণ্ঠন কৃত মাল আদায় না করবে।

জনতা! যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করেছে সে জাতিকে আল্লাহ অপমানিত করবেন। যে জাতির মধ্যে প্রকাশ্য ব্যভিচার ও বেহায়াপনা চলবে, আল্লাহ তা'আলা সে জাতির প্রতি নানা প্রকার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। হে জনতা! আমি দুর্বল আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য করব, আপনারাও আমার আনুগত্য করুন। আর আমি যদি তাঁদের নাফরমানি করি তাহলে আমার আনুগত্য করা আপনাদের প্রতি ওয়াজিব নয়। যখন আপনারা সলাত আদায় করেন, তখন আল্লাহ আপনাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন।

বাইয়াতের পর সর্বপ্রথম দায়িত্ব অর্পিত হয় খলীফার উপর রসূল ﷺ -এর গোসলের, কারণ প্রতিটি সাহাবাই রসূল ﷺ -কে গোসল দিয়ে নিজেকে ধন্য করার আশা পোষণ করতে ছিল। আবূ বাকর (রা.) ফায়সালা করলেন যে, রসূল ﷺ -কে গোসল দিবে তার পরিবার পরিজন। এই মীমাংসায় প্রত্যেকেই মুগ্ধ হলেন। গোসলের পর প্রশ্ন আসে রসূল ﷺ -কে দাফন করা হবে কোথায়? এই জটিল সমস্যারও সমাধান দেন ইসলাম জাহানের প্রথম খলীফা আবূ বাকর (রা.)। তিনি বলেন, যেখানেই যে নাবী ইন্তিকাল করবেন সেখানেই তাকে দাফন করা হবে। ফলে তাকে 'আয়িশা (রা.)-এর কক্ষেই দাফন করা হয়। রসূল ﷺ কত দূরদর্শিতার সাথে আবূ বাকর (রা.)-কে

ইমামতি করার দায়িত্ব দেন। মূলতঃ যা ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার পরোক্ষ নির্দেশ। রসূল ﷺ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে অত্যন্ত সহজভাবে তুলে ধরতেন যার ফলে সকল মতভেদ দূরীভূত হয়ে যেত।

নাবী কারীম ﷺ ইন্তিকালের পর একদল যাকাত প্রদানে অস্বীকার করল। আরবের কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীরা ধারণা করল, পৃথিবীতে মান-সম্মান ও ধন-সম্পদ লাভ করতে হলে যাকাতের মাধ্যমেই তা সম্ভব, সে জন্য যাকাত প্রথা চালু করা হয়েছে। তাই তারা বিরোধিতা করতে লাগল। তিনজন ভন্ড নাবী নবুয়তের দাবী করল। যুগ যুগ ধরে আরবে কোন উন্নত মানের শাসন ব্যবস্থা না থাকার ফলে তারা ছিল একেবারে লাগামহীন, ফলে তারা স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করে। একটি কাজ ছিল এই প্রকৃতির লোকদের বাধা প্রদান, দ্বিতীয় কাজ উসামাহর নেতৃত্ব সৈন্য প্রেরণ। এই সেনাবাহিনীকে সিরিয়া সম্রাটের মোকাবেলার জন্য রসূল ﷺ মোতায়েন করে রেখেছিলেন। এই দুই গ্রুপকেই আবু বাকর (রা.) শক্ত হাতে দমন করেন।

আল্লাহ ও তদীয় রসূলের সাথে প্রেম ঃ আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি তাঁর প্রেমের নমূনা তাঁরই মুখ হতে শুনা যাক। তিনি বলেন, আমার নিকট দুনিয়ার তিনটি বস্তু অতি প্রিয়। ১) রসূল ﷺ -এর পবিত্র মুখের পানে তাকিয়ে থাকা ২) রসূল ﷺ -এর প্রতি স্বীয় মাল ব্যয় করা ৩) আমার কন্যা 'আয়িশা রসূল ﷺ -এর গৃহিণী।

সলাত ঃ তিনি যখন রুকুতে যেতেন তখন কোমরকে পুরোপুরি বাঁকা করতে পারতেন না। আবূ বাকর (রা.) বলেন, এসো, আমরা ফজর পর্যন্ত এভাবেই সলাত আদায় করি তাহলেই কোমর বাঁকা করা সম্ভব হয়ে যাবে। এর বলে তিনি পূর্ণ রজনী সলাত আদায় করলেন এবং তার পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে।

সিয়াম ঃ গ্রীষ্মকালে তিনি সর্বদা নফল সিয়াম রাখতেন।

ভাষা ঃ তিনি সুমিষ্ট ভাষী ছিলেন, মদীনায় এক বৃদ্ধা ছিলেন, 'উমার (রা.) তার তদারকি করতেন। 'উমার (রা.) তার কাজ করে দিয়ে আসতেন, পানি দিয়ে আসতেন। 'উমার (রা.) কয়েক দিন লক্ষ্য করলেন কে এই কাজ করে দেয় তাই প্রত্যক্ষ করব। তিনি লুকিয়ে থাকলেন। এদিকে আবূ বাকর (রা.) এসে সেই বৃদ্ধার কাজ করে দিতে লাগলেন অথচ তিনি তখন খলীফা পদে অধিষ্ঠিত। 'উমার (রা.) আল্লাহর শপথ করে বললেন, এর পূর্ববর্তী দিনগুলির কাজ নিশ্চয় আপনিই করেছেন।

আনীসা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আবূ বাকর (রা.) আমাদের নিকট তিন বৎসর ছিলেন, দুই বৎসর খিলাফতের পূর্বে, এক বৎসর খিলাফতের কালে। এই সময় মেয়েরা আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট দুধ দুয়ে নিত। আবূ বাকর (রা.) যখন কাউকে সান্ত্বনা দিতেন তখন বলতেন, ধৈর্যধারণে কোন মুসীবত নেই। কান্নাকাটিতে কোনই উপকার নেই। মৃত্যুর পরে যা কিছু ঘটবে তার চেয়ে মৃত্যুই সহজতর। তোমরা যদি রসূলের ইন্তিকাল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর তাহলে তোমাদের মনে যাতনা কমে যাবে, অপরদিকে আল্লাহর নিকট সওয়াবও পাবে।

দানশীলতা ঃ একদা রসূল ﷺ তার সহচর বৃন্দকে সদাকাহ করার নির্দেশ দিলেন, তখন 'উমার (রা.)-এর নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে মাল ছিল। 'উমার (রা.) বর্ণনা দেন যে, সেদিন আমি স্থির করলাম আজ আমি আবূ বাকর (রা.) হতে দানশীলতার দিক দিয়ে বেড়ে যাব। তাই আমি সম্পূর্ণ মালের অর্ধেক নিয়ে রসূল ﷺ -এর নিকট হাজির হলাম। রসূল ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ীর জন্য কী পরিমাণ মাল রাখা হয়েছে? তিনি বললেন, এই পরিমাণ মাল বাড়ীতেও রেখে এসেছি। এবার আবূ বাকার (রা.) মাল নিয়ে উপস্থিত। রসূল ﷺ বললেন, হে আবূ

বাকর কতটা পরিমাণ মাল রাখা হয়েছে বাড়ীতে? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তদীয় রসূলের সন্তুষ্টি রেখে এসেছি। 'উমার (রা.) আল্লাহর শপথ করে বললেন, আমি কোন দিক দিয়ে আবূ বাকরকে (রা.) ডিঙ্গিয়ে যেতে পারব না।

বাহাদুরী ঃ একবার 'আলী (রা.) জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের নিকট সব চাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি কে? সবাই বললেন, আপনি। তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করি এটা কোন বীরত্ব নয়, বরং আসল বীর ও শক্তিশালী কে তাই বলো? সবাই বলেন, এটা আমাদের অজানা। তিনি বললেন, আমাদের মাঝে সব চাইতে বাহাদুর হলেন আবূ বাকর (রা.)। বদর প্রান্তরে রসূল ﷺ -এর জন্য পাশেই তাঁবু খাটানো হয়। প্রশ্ন হলো, কাফিরদের বাধাদানের জন্য রসূলের দেহরক্ষী হয়ে কে থাকবে? কেউই এই দায়িত্ব গ্রহণের দুঃসাহস দেখাল না। আবূ বাকর (রা.) শক্ত হাতে তরবারি ধারণ করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং প্রতিটি আঘাতের দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব দিলেন। একবার মক্কার মূর্তিপুজকরা রসূল ﷺ -এর প্রতি সীমাহীন নির্যাতন চালায় এবং বলে, তুমিই এক প্রভুর আহ্বান জানাচ্ছ। সেদিন মুশরিকদের বিরোধিতা করার একমাত্র আবূ বাকর (রা.) ছাড়া দ্বিতীয় কেউই সাহস করেননি। তিনি ধাক্কা দিয়ে মুশরিকদেরকে বিতাড়িত করলেন এবং বললেন আফসোস! তোমরা এমন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি বলেন, আমার প্রভু এক ও অদ্বিতীয়। এই বলে তিনি কেঁদে ফেলেন।

ঈমান ঃ 'আলী (রা.) আরও প্রশ্ন করেন, ফিরআউনের বংশধরের মু'মিন ভাল, না আবূ বাকর? সবাই নিশ্চুপ। তিনি বললেন, কেন নীরব, আবূ বাকরের এক ঘণ্টা তাদের হাজার ঘণ্টা অপেক্ষাও উত্তম। কেননা তারা তাদের ঈমান গোপন রাখত, অপরদিকে আবূ বাকর তার ঈমান প্রকাশ করে দেন।

কুরআনী জ্ঞান ঃ ইমাম আশআরী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সলাতে ইমামতি সেই ব্যক্তি করবে যে সর্বাধিক কুরআন বিষয়ে জ্ঞান রাখে। এই বর্ণনার পর আমরা যখন দেখলাম আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্যে রসূল ﷺ আবূ বাকর (রা.)-কে ইমামতি করার হুকুম দিলেন তখন স্পষ্টভাবে বুঝা গেল, সমস্ত সাহাবাগণের মধ্যে আবূ বাকর কুরআন বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। (কুরআন শুধু তিলাওয়াত নয়, অর্থ বুঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা)।

প্রতিবেশীর অধিকার ঃ একদিন 'আবদুর রহমান বিন আওফকে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখে বলেন, প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করো না। কারণ প্রতিবেশীর সঙ্গে পুনরায় তোমার সম্পর্ক গড়ে উঠবে, কিন্তু যারা তোমাদের ঝগড়া দেখল তারা বিভিন্ন জায়গায় চলে যাবে এবং তোমাদের ঝগড়ার কথা স্মরণ করবে।

আল্লাহভীরুতা ঃ হাসান (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আবূ বাকর (রা.) তার ইন্তিকালের পূর্বে বলেন, এই উট যার আমরা দুধ পান করতাম এবং এই পেয়ালা যাতে আমরা খাবার খেতাম, আর এই চাদর 'উমার (রা.)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দিবে- যেহেতু এগুলি আমি বাইতুল মাল হতে নিয়েছিলাম। যখন এগুলি 'উমার (রা.)-এর নিকট পৌঁছানো হলো, তিনি বললেন, আল্লাহ আবূ বাকরের প্রতি রহম করুন, তিনি খিলাফাতের দায়িত্ব কত কঠিন করে গেছেন।

উমর বিন খাত্তাব

(রাদিআল্লাহু আনহু)

বংশ পরিচয় ঃ সম্পূর্ণ নাম উমর বিন খাত্তাব (রা.)-র পিতার নাম ছিল খাত্তাব এবং মাতার নাম ছিল হান্‌তামা।

জীবনী ঃ নাবী কারীম ﷺ -এর বয়স যখন তের বৎসর সেই সময় উমর (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। যে সময় নাবী কারীম ﷺ নবুওয়াত লাভ করেন সে সময়ে গোটা কুরাইশদের মধ্যে মাত্র সতেরজন লোক লেখা পড়া জানতেন। তাঁর মধ্যে উমর ছিলেন একজন। সে সময়ের ইতিহাস থেকে জানা যায় উমর ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বীর এবং বিখ্যাত কুস্তিগীর। উকাযের মেলায় তিনি কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। সমকালিন বিখ্যাত কবিদের সমস্ত কবিতা ছিল তাঁর মুখস্থ, এবং তাঁর মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন তিনি। বংশ তালিকা বিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। ঐতিহাসিকগণ বলেন তাঁর জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির সুনাম চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কোন গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তাকেই দূত হিসেবে পাঠানো হত। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী এবং সে কারণে তাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হত। ফলে বিদেশের নেতৃবৃন্দ এবং শাসক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশার কারণে তাঁর জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি বিশেষ এক স্তরে উন্নিত হয়েছিল।

নেতৃত্বের গুণাবলী ঃ নেতৃত্বের যাবতীয় গুণাবলী তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সেই মূর্খতার যুগেও তিনি ছিলেন নেতা আবার ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনিই ছিলেন নেতা। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তাঁর মত ব্যক্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ কারণেই বিশ্বনাবী ﷺ তাঁর মত ব্যক্তিত্বের জন্য দু'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! উমর ইবনে খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশামকে ইসলামে উপস্থাপিত করে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী করো।'

ইসলাম গ্রহণ ঃ তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা ছিল বড় অপূর্ব। উমর (রা.)-র বংশের আরেকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোন সংবাদ রাখতেন না। উমর (রা.) যে সময় ইসলামের কথা শুনলেন তখন তিনি খুবই রেগে গেলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তিনি তাদের প্রাণের শত্রু হয়ে পড়লেন। তিনি যখন শুনলেন তাঁর এক দাসীও ইসলাম কবুল করেছে, তখন তিনি সেই দাসীর উপরে চরম নির্যাতন করলেন। দাসীকে যখন ইসলাম ত্যাগ করাতে সক্ষম হলেন না, তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, ইসলাম যার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে তাকেই তিনি এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিবেন। তারপর তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি বিশ্বনাবীর সন্ধানে বের হলেন। পথে তাঁর সাথে কথা হয়েছিল নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে। যে উমরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে উমর! তুমি এমন রাগের সাথে কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

লোকটির প্রশ্নের জবাবে উমর রেগে বললেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাথে একটা শেষ বুঝাপড়া করতে।' লোকটি তাঁকে সাবধান করে দেয়ার জন্য বললো, 'তাঁর কোন ক্ষতি করলে তাঁর গোত্রের লোকজনের হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে কি করে?' লোকটির একথায় উমর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি বোধহয় তাঁর আদর্শ গ্রহণ করেছো?' লোকটি উমরের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য দ্রুত কণ্ঠে বললো, 'একটি সংবাদ শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে, তোমার বোন এবং তাঁর স্বামী ইসলাম কবুল করেছে।'

এ কথা শোনার সাথে সাথে উমর রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি ছুটলেন তাঁর বোনের বাড়ির দিকে। তাঁর বোন ভগ্নিপতি ঘরের দরোজা বন্ধ করে সে সময় খাব্বাব (রা.)-এর কাছে সূরা ত্ব-হা শিখছিলেন। উমর বোনের বন্ধ দরজার কাছে যেতেই তাঁর কানে কুরআনের মধুর বাণী প্রবেশ করে তাঁর অন্তরের জমানো বরফ গলানো শুরু করে দিয়েছিল। তিনি গর্জন করে বোনের দরজায় আঘাত করলেন। উমরের আভাস পেয়ে খাব্বাব (রা.) আত্মগোপন করলেন। দরজা খুলে দেয়ার পরে উমর ঘরে প্রবেশ করে তাদের কাছে ধমকের সুরে জানতে চাইলেন, 'তোমরা কী পড়ছিলে? আমি তাঁর শব্দ পেয়েছি।'

তাঁরা জবাব দিলেন, 'আমরা পরস্পরের মধ্যে কথা বলছিলাম।' উমর বললেন, 'তোমরা বাপ-দাদার আদর্শ ত্যাগ করে মুহাম্মাদ ﷺ -এর আদর্শ গ্রহণ করেছো। তাঁর ভগ্নিপতি বললেন, 'আমাদের আদর্শ থেকেও অন্য আদর্শ যদি উত্তম হয় তাহলে তুমি কী করবে উমর?'

তাঁর মুখের কথা শেষ হতেই উমর ভগ্নিপতির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে অমানবিকভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। স্বামীকে বাঁচাতে এসে তাঁর বোনও ভাইয়ের হাতে রক্তাক্ত হলেন। বোনের শরীরে রক্ত দেখে উমর যেন চমকে উঠলেন। ইতিপূর্বেই তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, নির্যাতনের মুখেও তাঁর দাসী এই আদর্শ ত্যাগ করেনি। তাঁর বোন এবং ভগ্নিপতির অবস্থাও তেমনি। তাহলে কি আছে মুহাম্মাদ ﷺ -এর আদর্শের ভেতরে? প্রশ্নটি তাঁর ভেতরের পৃথিবীটা সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে দিল। তিনি কেমন যেন বিহবল হয়ে পড়লেন। অনুশোচনার কণ্ঠে তিনি তাঁর বোন ও ভগ্নিপতিকে বললেন, 'তোমরা কী পড়ছিলে আমাকে দেখাও!'

উমরের কণ্ঠের পরিবর্তন শুনেই তাঁরা অনুভব করেছিল, উমরের ভেতরে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। তাঁরা জানালো, 'আমরা যা পড়ছিলাম তা মহান আল্লাহর বাণী।' উমর (রা.) পবিত্র হয়ে এসে আল্লাহর কুরআন পড়তে লাগলেন। কিছুটা পড়েই তিনি করুণ কণ্ঠে আবেদন জানালেন, 'কোথায় আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ! আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।' উমরের এই কথা শুনে খাব্বাব (রা.) গোপন স্থান থেকে বের হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, 'হে উমর! আনন্দের সংবাদ গ্রহণ করো, তোমার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ দু'আ করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর রসূলের দু'আ কবুল করেছেন। তিনি এখন সাফা পাহাড়ের উপরে আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন।'

উমর আরকামের বাড়ির দিকে চলেছেন। হামজা ও তালহা (রা.) সে সময় আরকামের বাড়ির দরজায় কিছু সংখ্যক মুসলিমসহ পাহারা দিচ্ছিলেন। উমরকে কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে আসতে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। হামজা (রা.) সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'তাকে আসতে দাও, আল্লাহ যদি উমরের কল্যাণ করেন তাহলে সে ইসলাম গ্রহণ করে রসূল ﷺ -এর আদর্শ অনুসরণ করবে, আর যদি সে অন্য উদ্দেশ্যে আসে তাহলে তাঁর তরবারী দিয়েই তাকে হত্যা করা হবে।'

বিশ্বনাবী ﷺ সে সময় আরকামের বাড়ির ভেতরে অবস্থান করছিলেন। উমরের আগমনের কথা জানালে তিনি প্রশান্ত চিত্তে বলেছিলেন, 'তাকে আসতে দাও।'

এরপর উমর এসে পৌঁছলে রসূল ﷺ বের হয়ে এসে তাঁর তরবারীর গোড়ার দিক এবং পরনের কাপড় নিজের হাতে ধরে মমতাভরা কণ্ঠে বললেন, 'হে উমর! তুমি কি বিরত হবে না! হে আল্লাহ! উমর আমার সামনে, হে আল্লাহ উমরের মাধ্যমে তুমি তোমার ইসলামকে শক্তিশালী করো।' উমর আল্লাহর নাবী ﷺ -এর হাতে হাত রেখে ঘোষণা দিলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনার জন্য আপনার কাছে এসেছি।'

উমরের কণ্ঠে এমন ব্যাকুল আবেদন শুনে আল্লাহর নাবীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'বিশ্বনাবী ﷺ সে মুহূর্তে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিয়েছিলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামও নাবীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সেদিন তাওহীদের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন।

উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বনাবী ﷺ ইসলামী কার্যক্রম শুরু করার ছয় বছরের সময়। সে সময় উমরের বয়স ছিল ত্রিশ থেকে তেত্রিশ-এর মধ্যে।

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত ঃ ইসলামে প্রবেশ করে উমর (রা.) ঘোষণা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আর লুকোচুরি নয়, আল্লাহ বিরোধী মিথ্যে শক্তি প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাবে, আল্লাহর ঘর তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করবে আর আমরা যারা মহান আল্লাহর দাসত্ব করি তাঁরা কা'বায় সলাত আদায় করতে পারবো না, গোপনে সলাত আদায় করবো তা হতে পারে না। চলুন আমরা প্রকাশ্যে কা'বায় মহান আল্লাহকে সাজদাহ করবো।'

ইসলাম গ্রহণ করার পর মক্কাবাসীর প্রতিক্রিয়া ঃ উমর (রা.)-র ইসলাম গ্রহণ করার পর গোটা মক্কায় একটা শোরগোল সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিটি মানুষের মুখে ছিল সেই আলোচনা। কাফিরদের কাছে তা ছিল একেবারে অবিশ্বাস্য। তাঁরা হতবাক হয়ে পড়েছিল। এই শোরগোল শুনে বীর কেশরী আস ইবনে ওয়াঈল এসে সমবেত কুরাইশদের কাছে জানতে চাইলো, 'কী হয়েছে তোমাদের, এত হৈ চৈ করছো কেন?'

কুরাইশরা তাকে জানালো, 'সর্বনাশের সংবাদ হলো উমর মুহাম্মাদ ﷺ -এর দলে ভিড়েছে।' এ সংবাদ শুনে আস ইবনে ওয়াঈল বললো, 'উমর ঠিকই করেছে। আমি তাকে আশ্রয় দিলাম।' স্বয়ং উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করে সে রাতেই চিন্তা করলাম মক্কায় ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু কে আছে, তাকেই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানাবো। আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়লো ইসলামের বড় শত্রু হলো আবু জাহিল। পরদিন সকালে আমি আবু জাহিলের বাড়িতে চলে গেলাম। তাঁর ঘরের দরোজায় করাঘাত করে তাকে ডাকলাম। সে দরোজা খুলে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, উমর! তুমি আমার কাছে সকালে কি মনে করে এসেছো? আমি তাকে বললাম, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছি। আমার কথা শুনে আবু জাহিল বললো, আল্লাহ তোকে কলঙ্কিত করুক এবং যে সংবাদ নিয়ে তুই এসেছিস তাকেও কলঙ্কিত করুক। এই কথাগুলো বলতে বলতে সে আমার মুখের উপরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

হিজরত ঃ একমাত্র উমর (রা.) প্রকাশ্যে দিবালোকে হিজরত করেছে। তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে সশস্ত্রে বেরিয়ে পড়েন। রওনা দেয়ার আগে তিনি কুরাইশদের উপস্থিতিতে কাবা ঘরে গিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সাতবার কাবা ঘর তাওয়াফ করেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাক'আত সলাত আদায় করেন।

যুদ্ধে যোগদান ঃ সমস্ত যুদ্ধে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশে থাকতেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি আবু সুফিয়ানের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের তিনি হত্যার পরামর্শ দেন।

ইসলামের সেবা ঃ উমর (রা.)-এর পরামর্শে আবুবকর (রা.) আল কুরআন একত্রিত করেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেন। যাকাতের মাল সংরক্ষণের জন্য বাইতুল মালের ব্যবস্থা তিনিই করেন।

খিলাফত ঃ তাঁর খিলাফত কালে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক, ইরান, মিশর মুসলিমদের শাসনাধীনে আসে। তাঁর খিলাফতকে স্মর্ণযুগ বলা হয়।

প্রশাসন ঃ স্বেচ্ছাসেবকদের ভাতা প্রদান এবং নীতিমালা তৈরী করেন। এছাড়া বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা, ভূমি কর ও অন্যান্য কর নির্ধারণ এবং চাষাবাদের জন্য খাল খনন করেন। তিনি কুফা, বসরা, ফুসতাত, মুওতাত, মুওসাল শহরগুলোতে আবাদ করেন। বিজিত রাষ্ট্রসমূহকে প্রাদেশিক রাজ্যে বিভক্ত করেন। উশর আদায়ের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। জেলখানা ও পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। মুক্ত আবহাওয়ার পরিবেশে সৈন্যদের জন্য ছাউনি তৈরী করেন। দেশের খবরাখবরের জন্য পত্রিকার ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন শহরে অতিথিশালা তৈরী করেন। দরিদ্র আহলে কিতাবদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাদানের জন্য বেতন ধার্য করেন। মদীনা হতে মক্কার পথে বিশ্রামাগার তৈরী এবং ঝর্ণার ব্যবস্থা করেন।

চরিত্র ঃ তিনি প্রতিটি মানুষকে উপহার দিতেন। তিনি নিজেকে বাইতুল মালের একজন কর্মচারী ছাড়া আর কিছুই ভাবতেন না। তিনি ছিলেন আমানতদার, অধিক আল্লাহভীরু, আখিরাত সম্পর্কে সচেতন, সবসময় গরীবি হালে থাকতেন, বিলাশিতা করতেন না, অপব্যয় করতে না, কমদামী খাবার খেতেন। রাতের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের খবর নিতেন।

মৃত্যু ঃ তেইশ হিজরীর ২৬শে যুলহিজ্জা সকালে মসজিদে নববীতে ফজরের সলাত পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় ফিরোজ নামে একজন অগ্নিপূজক কৃতদাস উমর (রা.)-র প্রতি খন্‌জরের আঘাত করে। ফলে চব্বিশ হিজরীর ১লা মহর্‌রম তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রযিউন। নাবী কারীম ﷺ -এর পাশেই তাকে দাফন করা হয়।

উসমান বিন আফ্‌ফান

(রাদিআল্লাহু আনহু)

বংশ পরিচয় ঃ সম্পূর্ণ নাম 'উসমান বিন আফফান (রা.)-এর পিতার নাম আফফান বিন আবুল আস বিন উমাইয়া বিন আব্দে শামস্ । তাঁর মাতার নাম আরদী বিনতে কুরাইয বিন রাবিয়া বিন হাবীব বিন আব্দে শামস্ ।

ব্যক্তিত্ব ঃ যে দশজন সাহাবা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, তিনি হচ্ছেন তাদের অন্যতম । তিনি চার খলিফার মধ্যে তৃতীয় ছিলেন । তাঁর পূর্বের খলীফা আশারা মুবাশ্‌শারার ছয়জন এবং সমস্ত মুজাহিদ ও আনসারদের প্রতি খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেন । তিনি ঐ ছয়জনের একজন । তিনি আবূ বাকরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন । আবূ বাকর সিদ্দীকের অনুপ্রেরণাতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন । 'উসমান (রা.) চার নম্বরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন । রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা রুকাইয়ার সঙ্গে 'উসমানের বিবাহ দেন ।

হিযরত ঃ তিনি দু'বার আবিসিনিয়া হিজরত করেন । অতঃপর আবিসিনিয়া হতে মদীনা হিজরত করেন । উমার (রা.)-এর শাহাদাত বরণের পর তিনি খিলাফাতের দায়িত্বে নির্বাচিত হয়ে সুদীর্ঘ ১২ বছর শাসন পরিচালনা করেন । পঁয়ত্রিশ হিজরীতে ৮২ বৎসর বয়সে বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন । কেউ তাঁর বয়স ৮৬ আবার কেউ নব্বইও বলে থাকে ।

রাষ্ট্র পরিচালনা ঃ 'উসমান (রা.) অনেক রাজ্য জয় করে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন । পূর্ব দিকে খোরাসানের পাদদেশ, তুর্কীস্থান, সিন্ধু, কাবুল, পশ্চিম দিকে ইসকান্দারিয়া, মার্ভ, সাইপ্রাস, রোডস্ প্রভৃতি জয় করেন । 'উসমান (রা.)-এর খিলাফত কালে মুসলিমরা সর্বপ্রথম নৌ-পথে যুদ্ধ করে । এই যুদ্ধেই হেরাকলের নদীর বাঁধ বিধ্বস্ত করা হয় । অনেক বসতিপূর্ণ উপদ্বীপের উপর ইসলামের পতাকা উদিত হয় । তাঁরই নির্বাচিত অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতা ও কৃতিত্বের সাথে বড় বড় রাজ্য জয় করে । তিনি সর্বপ্রথম জায়গীর প্রথা চালু এবং গবাদি পশুর জন্য চারণ ভূমির ব্যবস্থা করেন । তিনি মাসজিদে সুগন্ধি, জুমু'আর সলাতের জন্য প্রথম আযান এবং মুয়াজ্জিনদের ভাতা নির্ধারণ করেন । বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধে রসূল ﷺ -এর সঙ্গে তিনি ছিলেন । মাল দিয়ে যুদ্ধ করার দিক দিয়ে 'উসমান (রা.) প্রথম কাতারে থাকতেন । তিনি রুমার কুয়ার অর্ধেক বারো হাজারে এবং পরে বাকী অংশটুকু আঠার হাজারে ক্রয় করে মদীনাবাসীদের পানি পানের সুব্যবস্থা করেন । তাবুকের যুদ্ধের জন্য এক হাজার উট ও সত্তরটি ঘোড়া সরঞ্জামাদিসহ উৎসর্গ করেন । এ ছাড়া নগদ চাঁদা প্রদান করেন ।

তাঁর গুণাবলী ঃ 'আবদুর রহমান বিন হাতিব বলেন, 'উসমান (রা.) যখন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তাঁর চেহারায় ভীতির ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠত । তিনি অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী, পরহেজগার এবং অধিক দানশীল ছিলেন! তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং শান্ত মেজাযের ছিলেন । সর্বদা নিজের কাজ নিজেই করতেন । প্রতি শুক্রবার তিনি একটি করে দাস মুক্তি দিতেন । প্রাক-ইসলামী যুগেও তিনি কুরাইশদের মধ্যে প্রভাবশালী ও দানশীল ছিলেন । অন্ধকার যুগেও তিনি মদ্যপান, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি অপকর্ম করতেন না । তিনি অহী লিখার কাজও করতেন । তাঁর স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল । তিনি দিনে অধিকাংশই সিয়াম রাখতেন এবং রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়তেন । সিয়ামের অবস্থায় তিনি শহীদ হয়েছেন ।

তাঁর মূল্যবান উপদেশ ঃ যে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে পারে সে আল্লাহর, আর যে গুনাহ ছাড়তে পারে সে ফিরিশতার এবং যে লোভ সংবরণ করে সে মুমিনদের প্রশংসা অর্জন করে ।

চারটি বস্তু মূল্যহীন ঃ ১) আমলহীন ইল্‌ম ২) ঐ সমস্ত মাল যা আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয় না ৩) ঐ পরহেজগারী যার দ্বারা দুনিয়া অর্জন করা হয় ৪) দীর্ঘ হায়াত যা আখিরাতের জন্য সম্বল সঞ্চার করে না।

দুনিয়াতে আমার নিকট তিনটি কাজ খুব আনন্দদায়ক ঃ ১) ক্ষুধার্তকে অন্ন দান ২) উলঙ্গকে বস্ত্র দান ৩) কুরআন মাজীদ নিজে পড়া এবং অপরকে পড়ানো।

বাহ্যত চারটি কাজে একটি করে গুণ রয়েছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটি করে জরুরী কর্তব্যও রয়েছে ঃ ১) সৎ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা একটা মহৎ গুণ বটে, কিন্তু এর সাথে একটি কর্তব্যও আছে সেটা হলো সৎ লোকের অনুসরণ করা ২) কুরআন পাঠ একটা বড় গুণ বটে কিন্তু তার সাথে সাথে আমল করাও জরুরী ৩) রুগীর শয্যার পাশে যাওয়া একটা বড় গুণ, তার সাথে অসীয়াত করাও কর্তব্য ৪) কবর যিয়ারত করা একটা বড় গুণ, তার সাথে সাথে কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করাও জরুরী কর্তব্য অর্থাৎ আমল করা।

চারটি কাজে আল্লাহর ইবাদাতের স্বাদ পাওয়া যায় ঃ ফরজ সমূহ আদায় করাতে ২) হারাম হতে বিরত থাকাতে ৩) সওয়াবের আশায় সৎ কাজ করাতে ৪) আল্লাহর ভয়ে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকাতে।

এগুলি আল্লাহভীরুর নিদর্শন ঃ ১) এমন ব্যক্তির সাহচর্য লাভ যার দ্বারা দ্বীনের সংশোধন হবে ২) দুনিয়ার সুখভোগকে বিপদ মনে করবে ৩) সন্দেহের ভয়ে হালাল হতেও বিরত থাকবে।

অবরোধ ঃ যখন বিদ্রোহীরা 'উসমান (রা.)-এর গৃহ অবরোধ করে রেখেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, তোমরা 'উসমানকে (আমাকে) হত্যা করো না। তোমাদের যে কেউ তাঁকে হত্যা করবে সে আল্লাহর দরবারে পঙ্গু হয়ে উঠবে। আল্লাহর অসি (তরবারি) এখন পর্যন্ত কোষেই আছে, কিন্তু তোমরা যদি আমাকে হত্যা করো তাহলে আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা কোষ হতে তরবারি বের করবেন যা আর কিয়ামত পর্যন্ত কোষের মধ্যে ঢুকবে না।

শাহাদাত ঃ কুরআন পাঠরত অবস্থায় তাঁকে শহীদ করা হয়। আয়াতের উপর রক্তের ফোঁটা পড়ে। যুবাইর বিন মুত'য়িম সলাতে জানাযার ইমামতি করেন। 'আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) দাফনের পূর্ণ ব্যবস্থা করেন। রাতের অন্ধকারে জুন্নুরাইন 'উসমান (রা.)-কে বাকী কবরস্তানে দাফন করা হয়।

আলী বিন আবু তালিব

(রাদিআল্লাহু আনহু)

বংশ পরিচয় ঃ সম্পূর্ণ নাম 'আলী বিন আবূ তালিব বিন আবদুল মুত্তালিব। তাঁর মাতার নাম ফাতিমাহ বিনতে আসাদ। পিতা আবু তালিব আবদু মান্নাফ। রসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম। চাচাকে একটু সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রসূল ﷺ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন আলীকে। এভাবে নাবী পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, রসূল ﷺ সোমবার নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, আর আমি মঙ্গলবার ইসলাম গ্রহণ করি। সে সময় আমার বয়স ৮/৯ বছর ছিল।

জীবনী ঃ তাবুকের যুদ্ধে রসূল ﷺ তাঁকে মদীনায় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রেখে যান। তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া সমস্ত যুদ্ধে তিনি রসূলের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর বীরত্ব খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি আশারা মুবাশ্‌শারার অন্যতম। 'আলী (রা.) রসূল ﷺ -এর চাচাতো ভাই ছিলেন। হাসান বিন যায়দ বলেন, শৈশবেও 'আলী (রা.) মূর্তি পূজা করেননি।

হিজরাতের সময় হল। অধিকাংশ মুসলিম মক্কা ছেড়ে মদীনা চলে গেছেন। রসূলে কারীম ﷺ আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। এ দিকে মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রসূলে কারীম ﷺ -কে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার। আল্লাহ তাঁর রসূলকে ﷺ এ খবর জানিয়ে দেন। তিনি মদীনায় হিজরাতের অনুমতি লাভ করেন। কাফিরদের সন্দেহ না হয় এ জন্য আলীকে রসূল ﷺ নিজের বিছানায় ঘুমাবার নির্দেশ দেন এবং আবূ বাকর সিদ্দিককে সঙ্গে করে রাতের অন্ধকারে মদীনা রওয়ানা হন। আলী (রা.) রসূলে কারীমের ﷺ চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ঘুমালেন। তিনি জানতেন, এ অবস্থায় তার জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল, এভাবে জীবন গেলে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হবে না। সুবহে সাদিকের সময় মক্কার পাষণ্ডরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল, রসূলে কারীমের ﷺ স্থানে তাঁরই এক ভক্ত জীবন কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে শুয়ে আছে। তারা ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ তা'আলা আলীকে (রা.) হিফাজত করেন।

হিজরতের রাত্রে রসূল ﷺ তাঁর নিকট রাখা মক্কাবাসীদের পবিত্র আমানত 'আলী (রা.)-কে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান। উক্ত আমানত স্ব-স্ব মালিকের নিকট পৌঁছে দিয়ে তিনিও মদীনা চলে যান। ইসলামের জন্য আলী (রা.)-র অবদান অবিস্মরণীয়। রসূলে কারীমের ﷺ যুগের সকল যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় তিনি দেন। এ কারণে রসূল ﷺ তাঁকে 'হায়দার' উপাধিসহ 'যুল-ফিকার' নামক একখানি তরবারি দান করেন। একমাত্র তাবুক অভিযান ছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাবুক অভিযানে রওয়ানা হওয়ার সময় রসূল ﷺ আলীকে (রা.) মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। বদরসহ প্রতিটি যুদ্ধে আলী ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ -এর পতাকাবাহী। উহুদ যুদ্ধে তাঁর শরীরের ষোল জায়গা ক্ষত-বিক্ষত হয়। তিনি খাযরাজের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকা ধারণ করেন। খায়বারের অত্যন্ত মজবুত দূর্গ 'কামুস' তিনি জয় করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, আল্লাহভীরুতায় তিনি ছিলেন অন্যতম।

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর তাঁর নিকট-আত্মীয়রাই কাফন দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। আলী (রা.) গোসল দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। জীবিকার অভাব-অনটন আলী (রা.)-র ভাগ্য থেকে কোন দিন দূর হয়নি। একবার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, রসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে থেকেছি। খলীফা হওয়ার পরেও ক্ষুধা ও দারিদ্রের সাথে

তাকে লড়তে হয়েছে। তবে তাঁর অন্তরটি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। কোন অভাবীকে তিনি ফেরাতেন না। এজন্য তাঁকে অনেক সময় সপরিবারে অভুক্ত থাকতে হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। নিজের হাতেই ঘর-গৃহস্থালীর সব কাজ করতেন। সর্বদা মোটা পোশাক পরতেন।

তিনি ছিলেন জ্ঞানের দরজা। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর কাছে এসে দেখতে পেত তিনি উটের রাখালী করছেন, ভূমি কুপিয়ে ক্ষেত তৈরী করছেন। আলী (রা.) ছিলেন একজন ভাল বক্তা ও কবি। আলী (রা.) ছিলেন নাবী খান্দানের সদস্য, যিনি নাবীর ﷺ প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন কুরআনের হাফিজ এবং একজন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির।

খিলাফাত ঃ 'উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর জনসাধারণ তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। আলী (রা.) পাঁচ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। একমাত্র সিরিয়া ও মিসর ছাড়া মক্কা ও মদীনাসহ সব এলাকা তাঁর অধীনে ছিল। ৩৬ হিজরীতে জামালের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৩৭ হিজরীর সফর মাসে সিফফীন নামক স্থানে মুয়াবিয়ার (রা.) সাথে সংঘর্ষ বাধে। ঐ বৎসরই খারিজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং তাদের সাথে যুদ্ধ বাধে।

শ্রেষ্ঠত্ব ঃ রসূল ﷺ তাবুকের যুদ্ধে 'আলী (রা.)-কে বলেন, তুমি আমার এত নিকটবর্তী যেমন হারুন (আ.) মূসা (আ.)-এর নিকটবর্তী। রসূল (আ.) বলেন, যারা মু'মিন তারাই তোমাকে তোমার আসল মর্যাদা দিবে। খায়বার যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে রসূল ﷺ বলেন, আগামীকাল আমি এই ইসলামের পতাকা এমন বীর পুরুষের হাতে তুলে দিবো যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিজয়ী করবেন। রসূল ﷺ তার হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দিয়ে বললেন ঃ আমি যার বন্ধু 'আলীও তার বন্ধু।

উমার (রা.) আলী (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফায়সালাকারী আলী।' আলী (রা.) নিজেকে একজন সাধারণ মুসলিমের সমান মনে করতেন এবং কোন ভুলের কৈফিয়তের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। একবার এক ইয়াহুদী তাঁর বর্ম চুরি করে নেয়। আলী (রা.) বাজারে বর্মটি বিক্রি করতে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি ইচ্ছা করলে জোর করে তা নিতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। আইন অনুযায়ী ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে মামলা দায়ের করেন। কাজীও ছিলেন কঠোর ন্যায় বিচারক। তিনি আলীর (রা.) দাবীর সমর্থনে প্রমাণ চাইলেন। আলী (রা.) তা দিতে পারলেন না। কাজী ইয়াহুদীর পক্ষে মামলার রায় দিলেন। এই ফায়সালার প্রভাব ইয়াহুদীর ওপর এতখানি পড়েছিল যে, সে মুসলিম হয়ে যায়। সে মন্তব্য করেছেল, 'এতো নাবীদের মত ইনসাফ। আলী (রা.) আমীরুল মুমিনীন হয়ে আমাকে কাজীর সামনে উপস্থিত করেছেন এবং তাঁরই নিযুক্ত কাজী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।'

শাহাদাত ঃ ৪০ হিজরীর ১৭ই রমাদান 'আবদুর রহমান বিন মুলজম নামক আততায়ীর হাতে বিষাক্ত ছুরির আঘাতে 'আলী (রা.) মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুকালে একটি গোলাম খরীদ করার জন্য জমা করা মাত্র সাত শ' দিরহাম রেখে যান।

পাঁচ খলিফার খিলাফতের সময় কাল (খ্রীঃ)

খলিফা	নাম (রা.)	খিলাফতের কাল	মৃত্যু (হিজরী/খ্রীঃ)	খিলাফতের মোট সময়
১ম	আবু বকর সিদ্দিক (রা.)	৬৩২ - ৬৩৪	১৩/৬৩৪	২ বৎসর, ৩ মাস, ৯ দিন
২য়	উমর বিন খাত্তাব (রা.)	৬৩৪ - ৬৪৪	২৩/৬৪৪	১০ বৎসর, ৫ মাস, ৪ দিন
৩য়	উসমান বিন আফ্ফান (রা.)	৬৪৪ - ৬৫৬	৩৫/৬৫৬	১২ বৎসর, ১১ দিন
৪র্থ	আলি বিন আবু তালিব (রা.)	৬৫৬ - ৬৬১	৪০/৬৬১	৪ বৎসর, ৯ মাস
৫ম	হাসান বিন আলি (রা.)	৬৬১ - ৬৬১	৫০/৬৭০	৬ মাস
			মোট =	২৯ বৎসর, ১১ মাস, ২৪ দিন

উম্মুল মু'মিনিন খাদিজাতুল কুবরা

(রাদিআল্লাহু আনহা)

জন্ম ঃ ৫৫৫ খৃস্টাব্দে মক্কা নগরীতে খাদিজা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খুওয়াইলিদ, মাতা ফাতিমা বিনতু যায়িদ। শৈশবকাল থেকেই তিনি নেক ও পবিত্র প্রকৃতির ছিলেন।

সফল ব্যবসায়ী ঃ খাদিজা (রা.) একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। সে সময় তাঁর ব্যবসা একদিকে সিরিয়া এবং অন্যদিকে সমগ্র ইয়েমেনে বিস্তৃত ছিল। এই বিরাট ব্যবসা পরিচালনার জন্য তিনি বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্বস্ততার কারণে তাঁর ব্যবসা ক্রমেই উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছিল। এসময় তিনি একজন অসাধারণ যোগ্য, মেধাসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত লোকের সন্ধানে ছিলেন, যাতে তিনি নিজের নেতৃত্বে এই সময় কর্মচারীকে বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে বাইরে প্রেরণ করতে পারেন।

রসূল ﷺ কে ব্যবসার কাজে নিযুক্ত ঃ যুগটি ছিল সেই যুগ যখন প্রিয় নাবী ﷺ -এর পবিত্র চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলীর কথা প্রতিটি ঘরে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। সে সময় তিনি ছিলেন যুবক এবং সমগ্র জাতির মধ্যে আমিন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি নিজের ব্যবসা তত্ত্বাবধানের জন্য এই ধরনের গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্ধানেই ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -কে বাণিজ্যিক পণ্য সিরিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে পাঠালেন এবং জানালেন যে, যদি এতে সম্মত হন তাহলে তিনি তাঁকে ভালভাবেই স্মরণ রাখবেন। প্রিয় নাবী ﷺ খাদিজার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন এবং বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে বসরা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

বিয়ের প্রস্তাব ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশ্বস্ততা এবং সুন্দর আচরণের বদৌলতে সকল পণ্য দ্বিগুণ লাভে বিক্রি হয়ে গেল। সফরকালে কাফেলা সরদার অর্থাৎ প্রিয় নাবী ﷺ সাথীদের সাথে এমন সুন্দর আচরণ করলেন যে, সকলেই তাঁর প্রশংসাকারী হয়ে গেল। কাফেলা যখন মক্কা ফিরে এলো তখন খাদিজা (রা.) সফরের বর্ণনা ও লাভের বিস্তারিত তথ্য শুনতে পেয়ে অতন্ত প্রভাবান্বিত হলেন এবং নিজের দাসী নফিসার মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। মুহাম্মাদ ﷺ ইঙ্গিত পেয়ে সে খাদিজা (রা.)-র চাচা আমর বিন আসাদকে ডেকে আনলেন। সে সময় তিনিই তাঁর অভিভাবক ছিলেন।

বিয়ে ঃ অন্যদিকে মুহাম্মাদ ﷺ নিজের চাচা আবু তালিব এবং বংশের অন্যান্য গণ্যমান্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে খাদিজা (রা.)-র বাড়ীতে গেলেন। আবু তালিব বিয়ের খুতবাহ পড়লেন এবং পাঁচ'শ দিরহাম মোহর নির্ধারিত হলো। সে সময় প্রিয় নাবী ﷺ এর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর।

ইসলাম গ্রহণ ঃ মুহাম্মাদ ﷺ এর ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত পাওয়ার পর মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারিণী হলেন খাদিজাতুল কুবরা (রা.)।

ইসলাম প্রচারে ত্যাগ ঃ ইসলামের ব্যাপকতায় খাদিজা (রা.) খুবই আনন্দিত হতেন এবং তিনি অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ ও উপহাসকে উপেক্ষা করে নিজেকে হকের দাওয়াতে রসূল ﷺ -এর সহযোগী হিসেবে প্রমাণ করতে লাগলেন। তিনি সমস্ত ধন-সম্পদ ইসলামের জন্য ও এতিম-বিধবাদের উন্নতি, অসহায়দের সাহায্য ও অভাবগ্রস্তদের অভাব দূরীকরণে দান করে দিয়েছিলেন।

বিপদে ধৈর্য্যধারণ ঃ প্রিয় নাবী ﷺ -এর সঙ্গে বিয়ের পর খাদিজাতুল কুবরা (রা.) প্রায় ২৫ বছর (অর্থাৎ ওহি নাযিলের প্রায় ৯ বছর পর পর্যন্ত) জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি রসূল ﷺ -এর সঙ্গে প্রত্যেক ধরনের অন্তর কম্পিত করা মুসিবত হাসিমুখে সহ্য করতেন এবং প্রিয় নাবী ﷺ -এর বন্ধুত্ব ও জীবন উৎসর্গের হক আদায় করেন।

কাফিরদের অর্থহীন এবং বাজে কথায় যখন রসূল ﷺ এর হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো তখন খাদিজাতুল কুবরা (রা.) বলতেন ঃ 'ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি দুঃখিত হবেন না। এমন কোন রসূল কি আজ পর্যন্ত আগমন করেছেন, যাঁকে নিয়ে মানুষ উপহাস করেনি!' খাদিজা (রা.)-র এই কথায় মুহাম্মাদ ﷺ -এর দুঃখ–কুষ্ট দূর হয়ে যেত। মোট কথা, সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনে খাজিদাতুল কুবরা (রা.) শুধুমাত্র রসূল ﷺ -এর দুঃখের ভাগীদারই ছিলেন না। বরং প্রতিটি আপদ-বিপদে তাঁকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

প্রিয় নাবী ﷺ বলতেন ঃ 'আমি যখন কাফিরদের নিকট থেকে কোন কথা শুনতাম এবং আমার নিকট অসহনীয় মনে হতো তখন আমি তা খাদিজা (রা.)-কে বলতাম। সে আমাকে এমনভাবে সাহস যোগাতো যে আমার অন্তর শান্ত হয়ে যেত। আর এমন কোন দুঃখ ছিল না যা খাদিজা (রা.)-র কথায় হাল্কা হতো না।'

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি খাদিজা (রা.)-র এত গভীর ভালোবাসা ও আস্থা ছিল যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে এবং পরে নাবী ﷺ যা কিছু বলেছেন সব সময় তাই তিনি জোরের সাথে সমর্থন ও সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এজন্য নাবী ﷺ তাঁকে সীমাহীন প্রশংসা করতেন।

নবুওয়াত প্রাপ্তির সাত বছর পর কোরাইশ মুশরিকরা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবসহ রসূল ﷺ এবং সকল নতুন মুসলিমদেরকে বয়কট করে এবং তারা প্রায় তিনটি বছর গাছের পাতা-ছাল খেয়ে পাহাড়ের ঢালে জীবনযাপন করে। এই বিপদের সময় খাদিজা (রা.) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। অবরোধের পুরো তিনটি বছর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট তিনি সাহসিকতার সাথে সহ্য করেন।

মৃত্যু ঃ নবুওয়াত প্রাপ্তির দশম বছরে এই নির্যাতনমূলক অবরোধ শেষ হয়। কিন্তু তারপর খাদিজা (রা.) বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। পবিত্র রমাদানে অথবা তার কিছুদিন পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রিয় নাবী ﷺ তাঁর চিকিৎসা ও সেবা-যত্নে কোনো কমতি করেননি। নবুয়তের ১০ম বছরের ১১ই রমাদান তিনি ইন্তিকাল করেন। মক্কার হাজুন নামক কবরস্তানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৬৫ বছর ছিল।

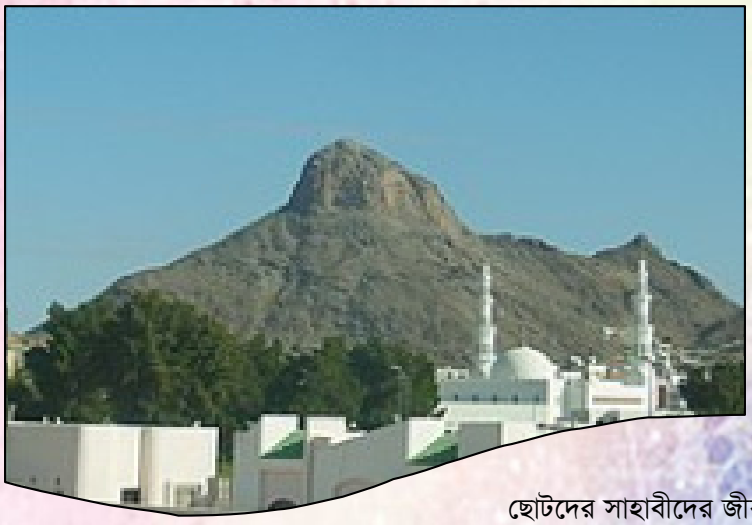

উম্মুল মু'মিনিন সাওদা

(রাদিআল্লাহু আনহা)

আল্লাহ সাওদা (রা.)-কে অত্যন্ত পূত-পবিত্র স্বভাব দান করেছিলেন। রসূলে কারীম ﷺ যখন হকের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন তখন তিনি দেরী না করে তাতে সাড়া দিলেন।

রসূল ﷺ এর স্ত্রী ঃ খাদিজা (রা.)-র ইন্তিকালের পর মাতাহীন শিশুদেরকে দেখে দেখে প্রিয় নাবী ﷺ মন মরা প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। রসূল ﷺ -এর একজন মহিলা সাহাবী খাওলাহ (রা.) একদিন নাবী ﷺ -এর সেবা করার প্রস্তাব করলেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! খাদিজা (রা.)-র ইন্তিকালের পর সব সময়ই আপনাকে বিষণ্ন দেখতে পাচ্ছি।" নাবী ﷺ বললেন, "হাঁ, সাংসারিক কাজ এবং শিশুদের লালন-পালন খাজিদা (রা.)-র উপরই ন্যস্ত ছিল।" খাওলা (রা.) আরজ করলেন, তাহলে তো আপনার একজন সাথী ও দুঃখের অংশীদার প্রয়োজন। অনুমতি পেলে আপনার দ্বিতীয় বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে পারি।"

নাবী ﷺ এই আরজ মঞ্জুর করলেন। খাওলা (রা.) তৎক্ষণাৎ সাওদা (রা.)-র নিকট গেলেন এবং তাঁর নিকট রসূল ﷺ-র ইচ্ছার কথা বর্ণনা করলেন। সাওদা (রা.) সন্তুষ্ট চিত্তে নাবী ﷺ-এর স্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দান করলেন।

মদীনায় হিজরত ঃ নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর নাবী ﷺ হিজরত করে মদীনা যান। মদীনায় পৌঁছে একটু স্থির হওয়ার পর যায়িদ ইবন হারিসাকে আবার মক্কায় পাঠান সাওদাসহ অন্যদের নেয়ার জন্য।

চরিত্র ঃ সাওদা (রা.) কিছুটা কড়া মেজাজের ছিলেন। অবশ্য তিনি সাধারণত হাসি-খুশি ছিলেন। এক রাতে রসূল ﷺ -এর সঙ্গে সলাত আদায় করলেন। নাবী ﷺ দীর্ঘক্ষণ রুকুতে রইলেন। সকাল হলে তিনি বলতে লাগলেন, "ইয়া রসূলল্লাহ! রাতে সলাতের সময় আপনি এত দীর্ঘক্ষণ রুকতে ছিলেন যে, আমার নাকশিরা ফেটে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। সুতরাং আমি অনেকক্ষণ যাবত নাক চেপে রেখেছিলাম।" নাবী ﷺ তাঁর কথা শুনে মুচকি হেসে দিয়েছেন।

দানশীলা ঃ সাওদা (রা.) অত্যন্ত রহম দিল এবং দানশীলা ছিলেন। যা কিছু তাঁর নিকট আসতো তা তিনি অত্যন্ত উদার হস্তে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। সাওদা (রা.) হাতের কাজে পারদর্শিনী ছিলেন এবং তায়েফের চামড়া প্রস্তুত করতেন। এই কাজে যা আয় হতো তা সব আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ফেলতেন।

ওমর ফারুক (রা.) তাঁকে উপহারস্বরূপ দিরহামের একটি থলে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি আছে? লোকজন বললো, "দিরহাম" তিনি বললেন, "থলেটি দেখতে তো খেজুরের থলের মতো।" এ কথা বলে তিনি খেজুর বন্টনের মত সকল দিরহাম অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

স্বামীর আনুগত্য ঃ বিদায় হজ্বের সময় রসূলে কারীম ﷺ সকল স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "আমার পরে নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে।" বস্তুত সাওদা (রা.) এবং যায়নাব (রা.) বিনতে জাহাশ কঠোরভাবে এই নির্দেশ পালন করেছিলেন। অন্য স্ত্রীগণ হজ্ব আদায় প্রশ্নে এই নির্দেশ ছিল না বলে মনে করতেন। কিন্তু সাওদা (রা.) এবং যায়নাব (রা.) রসূল ﷺ -এর ইন্তিকালের পর সারা জীবন ঘর থেকে বের হননি। সাওদা (রা.) বলতেন ঃ "আমি হজ্ব এবং ওমরাহ দু'টোই আদায় করেছি। এখন নির্দেশ অনুযায়ী ঘরে বসে থাকবো।"

মৃত্যু ঃ সাওদা (রা.) ওমর (রা.)-র শাসনামলে ২২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। রসূল ﷺ-এর ঔরসে সাওদার গর্ভে কোন সন্তান হয়নি। সাওদা (রা.) থেকে পাঁচটি হাদীস বর্ণিত আছে।

উম্মুল মু'মিনিন আয়িশা সিদ্দিকাহ

(রাদিআল্লাহু আনহা)

জন্ম ঃ নাম আয়িশা। উপাধি সিদ্দিকাহ এবং হোমায়রা। বাবার নাম আবুবকর সিদ্দিক (রা.)। মাতার নাম ছিল উম্মে রুমান (রা.)। নাবী ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির চার বছর পর শাওয়াল মাসে আয়িশা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব ঃ শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন সীমাহীন মেধাসম্পন্ন এবং শৈশবকালের সকল কথাই তাঁর স্মরণ ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, অন্য কোন সাহাবী অথবা সাহাবীয়ার এত স্মরণ শক্তি ছিল না।

বিয়ে ঃ হিজরতের তিন বছর আগে শাওয়াল মাসে রসূল ﷺ -এর সঙ্গে আয়িশা (রা.)-র বিবাহ সম্পন্ন হয়। আবুবকর সিদ্দিক (রা.) নিজে বিয়ে পড়ালেন। পাঁচশ' দিরহাম মোহর নির্ধারিত হলো। খুব সাদাসিধাভাবে আয়িশা (রা.)-র বিয়ে হয়েছিল। আয়িশা (রা.) জন্মগতভাবে মুসলিম ছিলেন। আয়িশা (রা.)-র সঙ্গে বিয়ের তিন বছর পর রসূল ﷺ আবুবকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে হিজরত করে মদীনা যান।

সাহসী ঃ আয়িশা (রা.) প্রিয় নাবী ﷺ এর উপর জীবন বাজি রাখতেন। একবার নাবী ﷺ রাতের বেলায় ঘুম থেকে উঠে কোথাও গেলেন। আয়িশা (রা.) চক্ষু খুললেন এবং রসূল ﷺ -কে না দেখে খুব চিন্তিত হলেন। পাগলিনীর মত উঠলেন এবং এদিক ওদিকে অন্ধকারের মধ্যে সন্ধান করতে লাগলেন। অবশেষে এক স্থানে নাবী ﷺ -কে দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, নাবী ﷺ সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মশগুল আছেন। এই সময় তিনি দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন।

তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল ঃ একবার সফরে আয়িশা (রা.)-র হার হারিয়ে গেল। নাবী ﷺ তা অনুসন্ধানে কতিপয় সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা হার অনুসন্ধানে বের হলেন। রাস্তায় সলাতের সময় হলো। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি ছিল না। এজন্য তাঁরা ওযূ ছাড়াই সলাত আদায় করলেন। ফিরে এসে তাঁরা রসূল ﷺ এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলেন। এ সময় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো।

সেবা-যত্ন ঃ আয়িশা (রা.)-র দাম্পত্য জীবনের ন'বছর পর প্রিয় নাবী ﷺ মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন। তের দিন যাবত তিনি মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। এই তের দিনের মধ্যে ৫ দিন তিনি অন্য স্ত্রীদের নিকট অবস্থান করেন এবং ৮ দিন ছিলেন আয়িশা (রা.)-র নিকট। কঠিন রোগের দুর্বলতার কারণে নাবী ﷺ আয়িশা (রা.)-র নিকট মিসওয়াক দিতেন। তিনি নিজের দাঁত দিয়ে তা চিবিয়ে নরম করে দিতেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবহার করতেন।

১১ হিজরীর ৯ অথবা ১২ই রবিউল আউয়ালে আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর নিজ ঘরের মধ্যে তাকে দাফন করা হয়। প্রিয় নাবী ﷺ এর মৃত্যুর সময় আয়িশা (রা.)-র বয়স ছিল ১৮ বছর।

জ্ঞান বিতরণ ঃ ৪৮ বছর তিনি বিধবা জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর থেকে ২ হাজার ২শ' ১০টি হাদীস বর্ণিত আছে। অনেকেই বলেছেন, শরীয়তের হুকুম আহকামের এক চতুর্থাংশ আয়িশা (রা.) থেকে বিবৃত হয়েছে।

বড় বড় সাহাবী (রা.ম) আয়িশা (রা.) থেকে সব ধরনের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতেন। আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বলেন, আমরা এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হইনি যার জ্ঞান আয়িশা (রা.)-র নিকট ছিল না। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসয়ালা সম্পর্কেই তিনি রসূল ﷺ এর আদর্শ পরিজ্ঞাত ছিলেন। উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইতিহাস এবং বংশনামা সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে উম্মুল মু'মিনিন আয়িশা (রা.)-র

থেকে বড় আর কাউকে দেখিনি। আহনাফ বিন কায়েস (রা.) এবং মুসা বিন তালহা (রা.) বলেছেন, আয়িশা (রা.)-র থেকে সুন্দর ভাষার লোক আমরা দেখিনি।

মুয়াবিয়া (রা.) বলেছেন, আয়িশা (রা.) থেকে বেশী জ্ঞানী বক্তা, শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগকারী এবং তীক্ষ্ম মেধার নারী আর আমি দেখিনি। বিভিন্ন রাওয়ায়েতে প্রমাণিত হয় যে, আয়িশা সিদ্দিকা (রা.)-র দ্বীনী জ্ঞান ছাড়াও চিকিৎসা, ইতিহাস এবং সাহিত্যেও বিশেষ দখল ছিল।

১০টি গুণের অধিকারী ঃ মহান আল্লাহ তা'আলার রহমতে আয়িশা (রা.) সকল সাহাবী ও মহিলা সাহাবীর মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। আয়িশা (রা.) স্বয়ং বলেছেন, আমার মধ্যে ১০টি গুণ এমন রয়েছে যা রসূল ﷺ এর অন্য স্ত্রীর মধ্যে নেই।

১. কুমারী অবস্থায় রসূল ﷺ এর সঙ্গে শুধু আমারই বিয়ে হয়।
২. জিবরিল আমিন (আ.) বলেন যে, আয়িশা (রা.)-কে বিয়ে করুন।
৩. আল্লাহ আমার উসিলায় পবিত্রতার আয়াত নাযিল করেন।
৪. আল্লাহ আমার উসিলায় তায়ামুমের আয়াত নাযিল করেন।
৫. আমার মাতা-পিতা উভয়েই মুহাজির।
৬. আমি রসূল ﷺ এর সম্মুখে থাকতাম এবং তিনি সলাতে মশগুল হতেন।
৭. আমি এবং রসূলে কারীম ﷺ একই পাত্রে গোসল করতাম।
৮. ওহী নাযিলের সময় শুধু আমি তাঁর পাশে থাকতাম।
৯. যখন প্রিয় নাবী মারা যান তখন রসূল ﷺ এর মাথা আমার কোলের উপর ছিল।
১০. আমার ঘরেই রসূল ﷺ -কে দাফন করা হয়।

অতিরিক্ত সম্মান ঃ ওমর ফারুক (রা.)-র খিলাফতকালে রসূল ﷺ -এর সকল স্ত্রীর (রা.মা) বার্ষিক ভাতা ছিল ১০ হাজার দিরহাম। অবশ্য আয়িশা (রা.) ১২ হাজার দিরহাম পেতেন। ওমর (রা.)-এর কারণ বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি রসূল ﷺ -এর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

আয়িশা (রা.)-র প্রায় দুশ ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন। আয়িশা (রা.) কোন হাদীস বর্ণনা কালে তার নেপথ্য কারণও বর্ণনা করতেন। যে ব্যাখ্যা তিনি দিতেন তা আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হতো না। তিনি অন্ধ আনুগত্য পছন্দ করতেন না। সব সময়ই প্রিয় নাবী ﷺ এর কথা ও কাজের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করতেন। যেমন কিছু কিছু হাদীস তিনি সংশোধন করে দিয়েছেন।

নৈতিক চরিত্র ও দানশীলাঃ নৈতিক মর্যাদার দিক থেকে আয়িশা (রা.)-র স্থান অনেক উর্ধে ছিল। তিনি অসীম দানশীল, অতিথিপরায়ণ এবং দরিদ্র সেবী ছিলেন। একবার আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা.) তাঁকে এক লাখ দিরহাম প্রেরণ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তা গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং দোপাট্টার আঁচল ঝেড়ে দিলেন।

আয়িশা (রা.) একদিন সিয়াম পালনরত অবস্থায় ছিলেন। এক ভিখারিনী এসে হাঁক দিল। তিনি দাসীকে সেই রুটি দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। দাসী বললো, সন্ধ্যায় ইফতার কী দিয়ে করবেন? উম্মুল মু'মিনিন বললেন, তাকে রুটিতো দিয়ে দাও। সন্ধ্যা হলো। এসময় কোন এক ব্যক্তি হাদিয়া হিসেবে বকরীর গোশ্ত প্রেরণ করলো। তিনি দাসীকে বললেন, দেখ, আল্লাহ রুটির চেয়ে উত্তম জিনিস প্রেরণ করেছেন।

ইবাদতকারী ঃ উম্মুল মু'মিনিন (রা.) রাত-দিনের বেশীর ভাগ সময়ই ইবাদত অথবা মাসয়ালা-মাসায়েল বলে কাটাতেন। স্নেহ-ভালোবাসায় তাঁর হৃদয় ছিল পূর্ণ। শত্রু এবং বিরোধীদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দিতেন। উম্মুল মু'মিনিন (রা.) গীবত বা পরনিন্দা এবং খারাপ কথা মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর থেকে বর্ণিত কোন হাদীসে কোন ব্যক্তিকে ছোট করার অথবা অপকথার একটি শব্দও পাওয়া যায় না। তিনি এত উদার হৃদয়ের অধিকারিণী ছিলেন যে, সতীনদের গুণাবলী ও প্রশংসা বর্ণনা করতেন।

আয়িশা (রা.) আল্লাহর ইবাদতের প্রতি গভীর আসক্ত ছিলেন। ফরয সলাত ছাড়াও বেশী বেশী সুন্নাত ও নফল সলাত আদায় করতেন। জীবনে তাহাজ্জুদ ও চাশতের সলাত বাদ দেননি। কঠোরভাবে হজ্ব পালন করতেন। রমাদানের সিয়াম ছাড়া প্রচুর নফল সিয়াম পালন করতেন। আয়িশা সিদ্দিকাহ (রা.)-র কোন সন্তান হয়নি।

আল্লাহভীতি ঃ তাঁর অন্তরে সীমাহীন আল্লাহভীতি ছিল। কোন সময় শিক্ষণীয় কোন কথা স্মরণ হলে শুধু কাঁদতেন। একবার তিনি বলেন, কান্না ছাড়া কখনো আমি পেট পুরে খাই না। তাঁর এক ছাত্র এই কথায় জিজ্ঞেস করলেন, তা কেন? তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যে অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করেন তা আমার মনে পড়ে। আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিন দু'বেলা পেট পুরে রুটি ও গোশ্ত খাননি।

মৃত্যু ঃ আয়িশা সিদ্দিকাহ (রা.) ৫৮ হিজরীর রমাদান মাসে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ওছিয়ত অনুযায়ী রাতে বিতরের সলাতের পর মদীনার বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

উম্মুল মু'মিনিন হাফসা বিনতে উমর

(রাদিআল্লাহু আনহা)

জন্ম ও বিয়ে ঃ হাফসা (রা.) ওমর (রা.)-র মেয়ে ছিলেন। হাফসা (রা.) নাবী ﷺ -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নাবী ﷺ হাফসা (রা.)-কে বিয়ে করেন।

মেজাজ ঃ হাফসা (রা.)-র মেজাজে কিছুটা কড়া সভাব ছিল এবং কখনো কখনো রসূল ﷺ -কে কড়া জবাব দিতেন। একদিন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা ওমর ফারুক (রা.) একথা জানতে পেরে হাফসা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি শুনেছি তুমি রসূল ﷺ -কে সমানে সমান জবাব দাও। এ কথা কি ঠিক?" হাফসা (রা.) বললেন- হ্যাঁ। ওমর (রা.) বললেন, তোমাদের মধ্যে যে এমন করে সে সফল হবে না। সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হাফসা (রা.) রসূলে কারীম ﷺ -কে সকল ধরনের মাসয়ালা নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করতেন। একবার নাবী ﷺ বললেন ঃ "বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

আল্লাহভীতি ঃ হাফসা (রা.) অত্যন্ত আল্লাহভীতু ছিলেন এবং বেশীর ভাগ সময় আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন। জিবরিল (আ.) হাফসা সম্পর্কে রসূল ﷺ -কে বলেছেন ঃ "তিনি অতিমাত্রায় সিয়াম পালনকারিণী এবং রাতের বেলায় খুব বেশী ইবাদতকারিণী।"

শিক্ষা ঃ রসূলে কারীম ﷺ হাফসা (রা.)-র শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসনাদে আহমদে আছে, রসূল ﷺ -এর নির্দেশ অনুযায়ী শাফা' (রা.) বিনতে আব্দুল্লাহ অদবিয়া তাঁকে লিখা শিখিয়েছিলেন। জানা যায় প্রিয় নাবী ﷺ কুরআনে হাকিমের সকল লিখিত অংশ একত্রিত করে হাফসা (রা.)-র নিকট রেখে দিয়েছিলেন। এই সকল অংশ রসূল ﷺ -এর মৃত্যুর পর সারা জীবন তাঁর নিকট ছিল। এটা একটি বিরাট মর্যাদার ব্যাপার ছিল।

দানশীলা ঃ মৃত্যুর পূর্বে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে ওসিয়ত করেন যে, গাবায় অবস্থিত তাঁর সম্পত্তি সদাকা করে ওয়াকফ করে দিতে। রসূল ﷺ -এর ঔরসে কোন সন্তান তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেনি।

জ্ঞানী ঃ জ্ঞান ও ফজিলতের দিক থেকেও হাফসা (রা.) অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তিনি ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ হাফসা (রা.) ৪৫ হিজরীতে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। মদীনার গভর্নর মারওয়ান জানাযা পড়ান এবং কিছুদূর পর্যন্ত মুর্দা কাঁধে করে নিয়ে যান। এরপর আবু হুরায়রা (রা.) জানাযা কবর পর্যন্ত নিয়ে যান। অতঃপর উম্মুল মুমিনিনের (রা.) ভাই আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) এবং ভ্রাতুষ্পুত্ররা লাশ কবরে নামান।

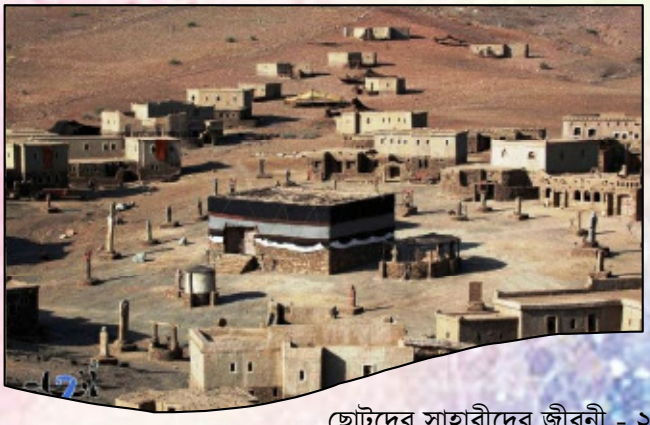

ফাতিমাতুজ জাহরা

(রাদিআল্লাহু আনহা)

পরিচয় ঃ ফাতিমা (রা.) রসূলে কারীম ﷺ -এর চতুর্থ এবং সবচেয়ে ছোট কন্যা ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি সব সময় মায়ের পাশেপাশে থাকতেন। তিনি এমন প্রশ্ন করতেন যাতে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পাওয়া যেত। নিজেকে অন্যের কাছে প্রদর্শনী করার মানসিকতা ছিল না। খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-র এক আত্মীয়ের ছিল বিয়ে। তিনি ফাতিমাতুজ জাহরা (রা.)-র জন্য ভালো কাপড় ও গহনা বানালেন। বিয়েতে যোগদানের জন্য যখন বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় এলো তখন ফাতিমা (রা.) এই দামী কাপড় এবং গহনা পড়তে অস্বীকার করলেন এবং সাদা-সিধেভাবেই বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন। শৈশবকাল থেকেই তাঁর সকল কাজে আল্লাহ প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো।

শিক্ষা ঃ মা খাদিজা (রা.) ফাতিমা (রা.)-র শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিতেন। একবার যখন তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন ফাতিমা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "আম্মাজান! আল্লাহর অসংখ্য কুদরত আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। আল্লাহ কি নিজে দেখা দিতে পারেন না?" খাদিজাতুল কুবরা উত্তর দিলেন, "মা আমার! যদি আমরা দুনিয়ায় ভালো কাজ এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করি তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সন্তুষ্টির হকদার হবো এবং সেখানেই আল্লাহর দেখা মিলবে।" ফাতিমা (রা.) থেকে ১৮টি হাদীস বর্ণিত আছে।

বাবাকে শান্তনা দান ঃ দ্বীন ইসলামের দাওয়াতের অপরাধে মুশরিকরা প্রিয় নাবী ﷺ -কে খুব কষ্ট দিত। যখন নাবী ﷺ ঘরে আসতেন তখন ফাতিমা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। কখনো পিতার কষ্ট দেখে দুঃখিত হয়ে পড়তেন। সে সময় নাবী ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন এবং বলতেন, "প্রিয় মা আমার! ঘাবড়িয়ো না। আল্লাহ তোমার পিতাকে একা ছেড়ে দেবেন না।"

একবার নাবী ﷺ মসজিদুল হারামে সলাত আদায় করছিলেন। কাফিররা উটের নাড়ি-ভুরি নিয়ে এলো এবং সিজদারত অবস্থায় রসূল ﷺ -এর ঘাড়ের ওপর রেখে দিল। জনৈক ব্যক্তি ফাতিমাতুজ জাহরার নিকট এসে বললো যে, তোমার পিতার সঙ্গে পাষন্ডরা এই ব্যবহার করছে। একথা শুনতেই তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং দৌঁড়ে কাবা গৃহে পৌঁছে ঘাড় থেকে নাড়ি-ভুরি সরালেন।

মদীনায় হিজরত ঃ এক সময় মক্কায় কাফির-মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আল্লাহ নির্দেশে রসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করলেন। মদীনা পৌঁছার কিছুদিন পর তিনি পরিবার পরিজনকে মদীনায় আনিয়ে নিলেন।

বিয়ে ঃ নাবী ﷺ আলী (রা.)-র সাথে ফাতিমা (রা.)-র বিয়ে দেন। নাবী ﷺ অতঃপর স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ফরয এবং অধিকার সম্পর্কে নসিহত করলেন। নাবী ﷺ নিজ মেয়েকে বিয়েতে যা উপহার দিয়েছিলেন তা হলো ঃ

১) উল ভরা মিসরী কাপড়ে প্রস্তুত বিছানা ২) নকশা করা একটি পালং ৩) খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ ৪) একটি মশক ৫) পানির জন্য দু'টি পাত্র ৬) একটি যাঁতা ৭) একটি পেয়ালা ৮) দুটি চাদর ৯) দুটি বাজুবন্দ ১০) একটি জায়নামায।

আচার-আচরণ ঃ ফাতিমাতুজ জাহরা (রা.)-র কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চাল-চলনে রসূলে কারীম ﷺ -এর সর্বোত্তম উদাহরণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী, ধৈর্যশীলা এবং দ্বীনদার মহিলা ছিলেন। ঘরের সকল কাজ নিজ হাতে করতেন। যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে হাত ফোস্কা পড়ে যেত। ঘর ঝাড়ু দেয়া এবং চুলা ফুঁকতে ফুঁকতে কাপড় ময়লা হয়ে যেত। কিন্তু এ সত্ত্বেও এসব কাজ থেকে রেহাই ছিল না। ঘরের কাজ ছাড়া বেশী বেশী ইবাদত করতেন। ফাতিমাতুজ জাহরা দারিদ্র ও বুভুক্ষায় তাঁকে পুরোপুরি সহযোগিতা করতেন। রসূল ﷺ তখনকার বাদশা ছিলেন কিন্তু জামাই ও কন্যা কয়েক বেলা অব্যাহতভাবে অভুক্ত থাকতেন। একদিন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আট প্রহর পর্যন্ত অনাহারে ছিলেন। কোন স্থানে মজুরির বিনিময়ে আলী (রা.) এক দিরহাম পেয়েছিলেন। তখন রাত হয়ে গেছে। কোন স্থান থেকে এক দিরহামের যব কিনে বাড়ী পৌঁছলেন। ফাতিমা (রা.) হাসি-খুশীভাবে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর নিকট থেকে যব নিয়ে পিষলেন। রুটি বানালেন এবং আলী (রা.)-র সামনে তা রাখলেন। তাঁর খাওয়ার পর তিনি খেতে বসলেন। আলী (রা.) বলেন, সে সময় আমার রসূল ﷺ -এর এই কথা স্মরণে এলো যে, "ফাতিমা দুনিয়ার সর্বোত্তম মহিলা"।

উত্তম শিক্ষা গ্রহণ ঃ একদিন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রসূল ﷺ নিকট গিয়ে হাজির হয়ে ঘরের কাজের কষ্টের কথা উল্লেখ করে একটি দাসী পাওয়ার জন্য আবেদন করলেন। রসূলে কারীম ﷺ তখন তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন এবং রাতে তাঁদের নিকট গেলেন এবং বললেন, তোমরা যে বস্তুর পাওয়ার কামনা করছিলে তা থেকে উত্তম একটি বস্তু আমি তোমাদেরকে বলছি। প্রত্যেক সলাতের পরে এবং শোয়ার সময় সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়ে নিও। এই আমল তোমাদের জন্য অতি উত্তম খাদিম হিসেবে পরিগণিত হবে।

ধৈর্য্যধারণ ঃ একবার রসূলে কারীম ﷺ ফাতিমাতুজ জাহরা (রা.)-র ঘরে গিয়ে দেখলেন যে, ফাতিমা (রা.) উটের চামড়ার পোশাক পরে আছেন এবং তাতেও ১৩টি তালি মারা। তিনি আটা পিষছেন এবং মুখ দিয়ে আল্লাহর কালাম উচ্চারণ করে চলেছেন। নাবী ﷺ এই দৃশ্য দেখে বিহবল হয়ে বললেন ঃ "ফাতিমা! ধৈর্য্যের মাধ্যমে দুনিয়ার কষ্ট শেষ কর এবং আখিরাতের স্থায়ী খুশীর অপেক্ষা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে নেক পুরস্কার দেবেন।"

দারিদ্রতা ঃ বাস্তবত ফাতিমা (রা.) প্রায়ই দু' বেলা না খেয়ে থাকতেন এবং সন্তানদের কোলে নিয়ে যাঁতা পিষতেন। একবার ফাতিমাতুজ জাহরা (রা.) মসজিদে নববীতে আসলেন এবং রুটির একটি অংশ প্রিয় নাবী ﷺ -কে দিলেন। নাবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "এই রুটি কোথেকে এলো?" ফাতিমা (রা.) বললেন, "আব্বাজান! সামান্য যব পিষে রুটি বানিয়েছিলাম। যখন বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছিলাম তখন খেয়াল এলো যে আপনাকেও কিছু খাইয়ে দিই। হে আল্লাহর রসূল! তৃতীয় বেলা অভুক্ত থাকার পর এই রুটি ভাগ্যে জুটেছে।" নাবী ﷺ রুটি খেলেন এবং বললেন ঃ "হে আমার কন্যা! চার বেলা অভুক্ত থাকার পর এই প্রথম রুটির টুকরা তোমার পিতার মুখে পৌঁছছে।"

উচ্চাভিলাশী ছিলেন না ঃ একবার নাবী কারীম ﷺ ফাতিমাতুজ জাহরা (রা.)-র ঘরে আসলেন দেখলেন যে, দরজায় রঙ্গীন পর্দা ঝুলছে এবং ফাতিমা (রা.)-র হাতে দু'টো রূপোর চুরি। এদেখে তিনি ফিরে এলেন। ফাতিমা (রা.) খুব মর্মাহত হলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এমন সময় রসূল ﷺ -এর দাস আবু রাফে (রা.) এসে উপস্থিত হলেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ফাতিমা (রা.) ঘটনা বললেন। তিনি বললেন, নাবী ﷺ চুরি ও পর্দা পছন্দ করেননি। ফাতিমা (রা.) তৎক্ষণাৎ উভয় বস্তুকেই রসূল ﷺ কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন

যে, তিনি এসব আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিয়েছেন। নাবী ﷺ খুব খুশী হলেন। নিজের কন্যার কল্যাণ ও বরকত কামনা করে দু'আ করলেন এবং তা বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দ্বীন ইসলামের কাজে ব্যয় করে দিলেন।

একবার ফাতিমা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নাবী কারীম ﷺ সাহাবী ইমরান (রা.) বিন হাছিনকে সঙ্গে নিয়ে ফাতিমা (রা.)-কে সেবা শুশ্রুষার জন্য গেলেন। বাড়ীর দরজায় দিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ফাতিমা (রা.) বললেন ঃ "আসুন"। নাবী ﷺ বললেন, আমার সঙ্গে ইমরান বিন হাছিনও রয়েছেন। ফাতিমা (রা.) জবাব দিলেন ঃ "আব্বাজান! এক টুকরা ছাড়া পর্দা করার মত দ্বিতীয় কোন কাপড় আমার নিকট নেই।" নাবী ﷺ নিজের চাদর ভেতরে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ "মা! এদিয়ে পর্দা করো।"

দানশীলা ঃ একবার আলী (রা.) সারা রাত ধরে একটি বাগানে সেচ দিলেন এবং মজুরী হিসেবে সামান্য পরিমাণ যব পেলেন। ফাতিমা (রা.) তা থেকে এক অংশ নিয়ে আটা পিষলেন এবং খাবার তৈরী করলেন। ঠিক খাবার সময় এক মিসকিন দরজায় কড়া নাড়লো এবং বললো, "আমি ক্ষুধার্থ।" ফাতিমা (রা.) সম্পূর্ণ খাবার তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট কিছু অংশ নিয়ে পিষলেন এবং খাবার তৈরী করলেন। খাবার তৈরী শেষ হতেই একজন দরজায় এসে হাত পেতে দাঁড়ালো। তিনি সব খাবার তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট অংশ পিষলেন এবং খাবার তৈরী করলেন। ইতিমধ্যে একজন মুশরিক কয়েদী আল্লাহর রাস্তায় খাবার চাইলো। সেই সকল খাবার তাকে দিয়ে দেয়া হলো। মোট কথা বাড়ীর সকলেই সেদিন অভুক্ত রইলেন। আল্লাহ পাক তাঁদের এই দানকে এমন পছন্দ করলেন যে, তাঁদের সবার জন্য এই আয়াত নাযিল হলো। এবং সে আল্লাহর রাস্তায় মিসকিন, এতিম এবং কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়।

ইবাদতকারী ঃ ফাতিমাতুজ জাহরা (রা.) খুব ইবাদতকারিণী ছিলেন। হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি আমার আম্মাকে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ইবাদত করতে এবং আল্লাহর দরবারে কাঁদতে দেখেছি।

একবার ফাতিমা (রা.) অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ থেকেও সারা রাত ইবাদতে কাটালেন। সকালে আলী (রা.) যখন সলাতের জন্য মসজিদে গেলেন, তখন তিনি সলাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। সলাত শেষ করে যাঁতা পিষতে লাগলেন। আলী (রা.) ফিরে এসে তাঁকে যাঁতা পিষতে দেখে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রসূলের কন্যা! এতো পরিশ্রম কর না। কিছুক্ষণ আরাম কর। তা না হলে অসুখ বেড়ে যেতে পারে।"

ফাতিমা (রা.) বলতে লাগলেন ঃ আল্লাহর ইবাদত এবং আপনার আনুগত্য অসুখের সর্বোত্তম চিকিৎসা। এরমধ্যে যদি কোনটি মৃত্যুর কারণ হয় তাহলে তারচেয়ে বেশী আমার জন্য আর সৌভাগ্যের কী হতে পারে।"

মহিলাদের গুণ ঃ একবার নাবী ﷺ ফাতিমা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "প্রিয় কন্যা! (মুসলিম) মহিলার কী কী গুণ রয়েছে?" তিনি বললেন ঃ "আব্বাজান! মহিলাদের উচিত আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আনুগত্য করা, সন্তানদের প্রতি স্নেহবৎসল হওয়া, নিজের দৃষ্টি অবনত রাখা, নিজের রূপ গোপন রাখা, নিজে অপরকে না দেখা এবং অন্যও যাতে দেখতে না পায় সে ব্যবস্থা করা।" নাবী ﷺ এই জবাব শুনে খুব খুশী হলেন।

সন্তান ঃ ফাতিমা (রা.)-র ৬টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। হাসান (রা.), হোসাইন (রা.), মুহসিন (রা.), উম্মে কুলছুম (রা.), রোকেয়া (রা.) ও যয়নব (রা.)। মুহসিন (রা.) এবং রোকেয়া (রা.) শৈশবকালেই মারা যান।

অগ্রিম মৃত্যুর সংবাদ ঃ প্রিয় নাবী ﷺ -এর ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে ফাতিমা (রা.) খবর নেয়ার জন্য আয়িশা সিদ্দিকাহ (রা.)-র ঘরে গেলেন। নাবী ﷺ অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁকে নিজের কাছে বসালেন এবং কানে আস্তে

আস্তে কিছু বললেন। এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর নাবী ﷺ অন্য কোন কথা তাঁর কানে কানে বললেন। এ কথা শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। যখন তিনি ফিরে চললেন তখন আয়িশা সিদ্দিকাহ (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে ফাতিমা! তোমার কাঁদা এবং হাসার মধ্যে কি রহস্য রয়েছে?" ফাতিমা (রা.) বললেন, "যে কথা নাবী ﷺ গোপন রেখেছেন, আমি তা প্রকাশ করবো না।"

রসূলে কারীম ﷺ -এর মৃত্যুর পর সেই দিনের ঘটনার বিস্তারিত প্রকাশ করলেন ঃ "প্রথমবার নাবী ﷺ বলেছিলেন যে, প্রথমে জিবরীল আমীন (আ.) বছরে সব সময় একবার কুরআন মজিদ পাঠ করতেন। এই বছর নিয়ম ভঙ্গ করে দু'বার পাঠ করেছেন। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, আমার মৃত্যুর সময় নিকটে এসে গেছে।" এতে আমি কাঁদতে লাগলাম। অতঃপর নাবী ﷺ বলেছিলেন ঃ "আহলে বাইতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং তুমি জান্নাতে মহিলাদের নেত্রী হবে।" এ কথায় আমি খুব খুশী হলাম এবং হাসতে লাগলাম।

মৃত্যু ঃ রসূল ﷺ -এর ইন্তিকালের ৬ মাস পরই ১১ হিজরীর রমাদান মাসে ২৯ বছর বয়সে তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে আসমা (রা.) বিনতে আমিসকে ডেকে বলেছিলেন ঃ "আমার জানাযা দেয়ার সময় এবং দাফনের সময় পর্দার পুরো ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং আপনি ও আমার স্বামী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট থেকে গোসলের ব্যাপারে সাহায্য নেয়া যাবে না। দাফনের সময় বেশী ভিড় হতে দেয়া যাবে না।"

আবু হুরাইরা আদ দাওসী

(রাদিআল্লাহু আনহু)

পরিচয় ঃ আবু হুরাইরা দাওস গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াতীম ছিলেন এবং মায়ের সাথে বসবাস করতেন। অন্য কোন আত্মীয় ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদু শামস। ইসলাস গ্রহণের পর রসূল ﷺ তার নাম আবদুর রহমান রাখেন। 'আবু হুরাইরা' তাঁর উপনাম। ছোট বেলায় একটি বিড়ালের বাচ্চার সাথে তিনি সবসময় খেলতেন। তা দেখে সাথীরা তাঁর নাম দেন আবু হুরাইরা (বিড়ালের বাবা)।

ইসলাম গ্রহণ ঃ ইসলাম গ্রহণের পর তিনি দাওস গোত্রের সাথেই অবস্থান করতে থাকেন। ষষ্ঠ হিজরী সনে তাঁর গোত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে তিনিও মদীনায় এলেন রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করতে। খাইবার বিজয়ের বছর সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসে তিনি প্রথম মদীনায় আসেন। মদীনায় আসার পর তিনি মসজিদেই অবস্থান করতে থাকেন।

মায়ের ইসলাম গ্রহণ ও সুন্দর আচরণ ঃ রসূল ﷺ জীবিত থাকা অবস্থায় আবু হুরাইরার স্ত্রী বা সন্তান ছিল না। একমাত্র তাঁর বৃদ্ধা মা ছিলেন। তিনি মাকে সব সময় ইসলামের দাওয়াত দিতেন, আর তিনি অস্বীকার করতেন। তিনি গভীর ব্যথা ও দুঃখ অনুভব করতেন। একদিন তিনি মাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানালে তার মা নবী ﷺ সম্পর্কে এমন কিছু খারাপ কথা বলেন যাতে আবু হুরাইরা ভীষণ কষ্ট পান। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রসূল ﷺ-এর নিকট হাজির হন। রসূল ﷺ-কে বলেন, আপনি আবু হুরাইরার মায়ের অন্তরটি ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। রসূল ﷺ দু'আ করলেন। আল্লাহ সেই দু'আ কবুল করেছেন। তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মা যতদিন জীবিত ছিলেন মায়ের সাথে সবসময় ভাল আচরণ করতেন। তিনি যখন বাড়ী থেকে বের হতেন, মায়ের ঘরের দরজায় গিয়ে বলতেন, 'মা আসসালামু আলাইকি ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।' জবাবে মা বলতেন, 'প্রিয় সন্তান, ওয়া আলাইকাস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।' মা-ছেলে এভাবে সালাম বিনিময় করতেন।

জ্ঞান অর্জন ঃ জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানচর্চা তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি নিজের জন্য যেমন জ্ঞান ভালোবাসতেন, তেমনি অপরের জন্যও। তিনি হাজার হাজার হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করে সংরক্ষণ করে গেছেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ এবং রসূল ﷺ-এর মজলিসে উপস্থিতির ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানের কারণে জীবনে তিনি এত ক্ষুধা ও দারিদ্র সহ্য করেছেন যে তার সময়ে কেউ তা করেননি।

মদীনার শাসক ঃ দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা.) আবু হুরাইরাকে বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। মুয়াবিয়ার শাসনামলে আবু হুরাইরা একাধিকবার মদীনার শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে শাসন ক্ষমতা তাঁর স্বভাবগত মহত্ব, উদারতা ও অল্পেতুষ্টি ইত্যাদি গুণাবলীতে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারেনি।

মৃত্যু ঃ মৃত্যুর শয্যায় তিনি আকুল হয়ে কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করা হলো কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, তোমাদের এ দুনিয়ার জন্য আমি কাঁদছি না। কাঁদছি, দীর্ঘ ভ্রমণ (দুনিয়ার জীবনকাল) ও স্বল্প পাথেয়'র (আখিরাতের জন্য নেক আমল) কথা চিন্তা করে। যে রাস্তাটি জান্নাতে বা জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছেছে, আমি এখন সে রাস্তার শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি। জানিনে, আমি সেই দু'টি রাস্তার কোনটিতে যাব। তিনি প্রায় ৭৮ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন কালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরিশ বছরের কিছু বেশী।

বিলাল ইবন রাবাহ

(রাদিআল্লাহু আনহু)

পরিচয় ঃ বিলাল (রা.) আফ্রিকান কাল একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তিনি নাবী কারীম ﷺ -এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও মদীনার মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস।

ইসলাম গ্রহণ ও অত্যাচার ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মুনিব উমাইয়া বিন খালফ তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করতে লাগলো। ইসলামের মহাশত্রু উমাইয়া নিজের ভৃত্য বিলালকে তাওহীদের বিশ্বাস থেকে ফিরানোর জন্য অমানুষিক ও নির্মম অত্যাচারের ব্যবস্থা করেছিল। দুপুরের সূর্য্যের তাপে গরম বালুর উপর সে বিলালকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত। যাতে করে তিনি একটুও নড়াচড়া করতে না পারেন। উপরে প্রচন্ড সূর্যের তাপ নিচে আগুনের মত বালু- এই ধরনের নিষ্ঠুর অত্যাচারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হয় তিনি মরে যাবেন নতুবা অসহ্য হয়ে ইসলাম ত্যাগ করবেন। কিন্তু দেখা গেল তাকওয়াবান মুজাহিদ তখনও আল্লাহকে ভুলেননি' মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে উঠতেন 'আহাদ' 'আহাদ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই।

তাঁকে ধারাবাহিকভাবে অত্যাচার করা হতো, কখনও আবু জাহিল, কখনও উমাইয়া, কখনও ইসলামের অন্য শত্রুরা এসে তাঁকে দৈহিক নির্যাতন করতো, রাতেও তাঁর শান্তি ছিল না, যখন তাঁকে বেত মারা হতো, ফলে পূর্ব দিনের জখমগুলো রক্তাক্ত হয়ে উঠত, পুনরায় তাঁকে যখন আবার উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দেয়া হত তখন তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চর্বি গলে পড়তো। মাঝে মাঝে তাঁকে মক্কার দুষ্ট তরুণ দলের হাতে ন্যাস্ত করা হতো- তারা তাঁর গলায় রশি বেঁধে মক্কার রাজপথে সারা দিন টেনে-হেচ্ড়ে বেড়াত। আবার সন্ধ্যায় তাঁকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফিরিয়ে আনতো, কিন্তু এত অত্যাচারের পরেও তিনি তাওহীদের বিশ্বাস থেকে বিন্দু পরিমাণ সরে আসেননি।

কৃতদাস থেকে মুক্তি ঃ নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় একদিন আবুবকর সিদ্দিক (রা.) তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে মুক্ত করে দেন। নাবী কারীম ﷺ তাঁকে মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করলেন।

ইসলাম প্রতিষ্ঠা ঃ ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সব সময় রসূল ﷺ -এর সাথে সকল কাজে সহযোগীতা করেছেন, ত্যাগ শিকার করেছেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

মদীনা ত্যাগ ঃ আল্লাহর রসূলের ইন্তিকালের পর বিলাল (রা.) -কে সফরের সরঞ্জামসহ কোথাও রওয়ানা হতে দেখে উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, মনে হচ্ছে তুমি যেনো কোথাও চলে যাচ্ছো? বিলাল বললেন, 'উমর, যে মদীনায় রসূল নেই, সেখানে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। রসূল শূন্য মদীনা আমার কাছে অসহনীয়। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কোনো দূর দেশে গিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রচারে লিপ্ত থেকে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো পার করে দেবো।' বিলাল দামেশকে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন পরে এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, রসূলের বিচ্ছেদ বেদনায় তিনি মদীনা ত্যাগ করেছেন, সেই রসূল স্বপ্নে তাঁকে বলছেন, হে বিলাল! তুমি আমার কাছে আর আসো না কেনো?

মদীনায় ফিরে আসা ঃ বিলালের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। রসূলের বিচ্ছেদ বেদনা তাঁর মধ্যে পুনরায় নতুন করে জেগে উঠলো। মদীনায় গেলে জীবিত রসূলকে তো দেখা যাবে না, কিন্তু আল্লাহর রসূল যে পথে হেঁটেছেন, সেই

পথ এবং সেই পথের ধূলি তো দেখা যাবে- যে ধূলিতে মিশে রয়েছে আল্লাহর রসূল ﷺ -এর পায়ের স্পর্শ। মদীনায় যাবার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন এবং দ্রুত বেগে তিনি মদীনার দিকে ছুটলেন।

আযান ঃ মদীনায় বিলাল এসেছে- এ সংবাদ সকলেই জেনে গেলো। রসূলের মুয়াজ্জিন এখন মদীনায়, লোকজন দলে দলে এসে তাঁকে অনুরোধ করলো, বিলাল! আল্লাহর রসূল জীবিত থাকতে তুমি আযান দিয়েছো, আমরা আযান শোনামাত্র মসজিদে ছুটে এসে আল্লাহর নাবীর পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছি। তুমি আজ আবার আযান দাও। আমাদের কাছে মনে হবে, আল্লাহর রসূল এখনো জীবিত আছেন! মসজিদে গেলে আবার আমরা রসূলের পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়াতে পারবো! দেখতে পাবো রসূল ﷺ -এর চেহারা।

বিলাল (রা.) রাজী হলেন না, তিনি বললেন, 'মদীনাবাসীরা তোমরা শোন, আমি যখন মসজিদে নববীর মিনারে উঠে আযানের মধ্যে বলতাম 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' তখনি আমার নজর পড়তো মিম্বরের উপর উপবিষ্ট নাবী কারীম ﷺ -এর চেহারার প্রতি। কিন্তু আজকে আযান দিতে গিয়ে যখন আমার দৃষ্টি পড়বে মসজিদে নববীর মিম্বারের দিকে, তখন দেখবো মিম্বার শূন্য- সেখানে রসূল নেই। এই দৃশ্য তো আমি সহ্য করতে পারবো না।' অবশেষে আল্লাহর রসূলের নাতী হাসান-হোসাইন (রা.)-র অনুরোধে বিলাল (রা.) উপেক্ষা করতে পারলেন না, তিনি মসজিদের মিনারে উঠে আযান দিতে লাগলেন। দীর্ঘদিন পর বিলাল (রা.)র আযানের সুমধুর ধ্বনি মদীনাবাসীদের পাগল করে তুললো। রসূল হারানোর শোকে মদীনায় মাতম উঠলো। মদীনায় উঠলো কান্নার রোল।

মৃত্যু ঃ বিলাল 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করছেন আর স্বভাব মতোই মিম্বরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি দেখলেন, সেখানে প্রিয় রসূল নেই। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর কিছুদিন তিনি মদীনায় অবস্থানের পর আবার মদীনা হতে চলে গেলেন। হিজরী বিশ সনের কাছাকাছি তিনি দামেশক নগরে ইন্তিকাল করেন।

খাব্বাব ইবনুল আরাত

(রাদিআল্লাহু আনহু)

কে এই খাব্বাব ? যাঁরা দ্বীন ইসলামের জন্য নিজেদেরকে কুরবানী এবং আল্লাহর রাস্তায় কঠিনতম শাস্তি ভোগ করেছিলেন, খাব্বাব (রা.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রাথমিক স্তরের পাঁচ ছয় জনের ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মুসলিম হন। সুতরাং তাঁকে যে কি ধরনের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর জীবনের পরিবর্তন অন্ত্যন্ত হৃদয়-বিদারক। তাঁর প্রতি কাফিরদের অত্যাচারের শেষ ছিল না। লৌহ জেরা পরিয়ে তাঁকে আরবের মরুভূমির প্রচন্ড রোদে শুয়ে রাখা হতো। উত্তাপে তাঁর কোমরের গোশত পর্যন্ত গলে যেত।

ইসলাম গ্রহণ ও অত্যাচার সহ্য ঃ তিনি জনৈকা স্ত্রী লোকের গোলাম ছিলেন। সেই স্ত্রী লোকটির নিকট যখন সংবাদ পৌঁছল যে, খাব্বাব মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাথে মিলিত হয়েছেন। তখন থেকে স্ত্রী লোকটি লোহার শলাকা গরম করে তাঁর মাথায় দাগ দিতে লাগল। এরপরেও খাব্বাব (রা.) কোনক্রমেই বিচলিত হচ্ছেন না দেখে একদিন কোরাইশ দলপতিগণ মাটিতে জ্বলন্ত আগুনের কয়লা বিছিয়ে তার উপর তাঁকে চিৎ করে শুয়ানো হতো এবং কিছু পাষণ্ড তার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরতো। আগুনোর কয়লাগুলো তার পিঠের গোস্ত-চর্বি পুড়াতে পুড়াতে এক সময় নিভে যেত, তবুও নরাধমরা তাঁকে ছাড়ত না। খাব্বাব (রা.)র পিঠের চামড়া এমনভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে, শেষ বয়স পর্যন্ত তার সমস্ত পিঠে ধবল কুষ্ঠের ন্যায় ঐ দাগের চিহ্ন বিদ্যামান ছিল।

জীবনি ঃ তিনি কর্মকার ছিলেন। তিনি ঢাল-তরবারী ইত্যাদি প্রস্তুত করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর যে সকল লোকের নিকট তার সকল প্রাপ্য ছিল, কোরাইশদের নির্দেশমতে তা কেউই আর দেয়নি। উমর (রা.)র খিলাফতের সময় তিনি খাব্বাব (রা.)কে তাঁর প্রতি ইসলাম বিরোধিদের নির্যাতন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁর পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করলেন। উমর (রা.) তাঁর কোমর দেখে বললেন, এমন কোমর তো আর আমি কারো দেখিনি। খাব্বাব (রা.) বললেন, আমাকে আগুনের অঙ্গারে চেপে রাখা হতো। তাতে আমার রক্ত এবং চর্বি গলে আগুন নিভে যেত।'

আল্লাহভীতি ঃ মহান আল্লাহর রহমতে সাহাবায়ে কেরাম ও নাবী কারীম ﷺ -এর অসীম ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে ইসলাম বিজয়ী হবার পরে ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রাচূর্যতা দেখা দিয়েছিলো। প্রায় সাহাবায়ে কেরামই স্বচ্ছলতা লাভ করেন। খাব্বাব যখন রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন কেউ কেউ তাঁকে বলেছিলেন, আপনি খুশী হন যে, ইন্তিকালের পরে আপনি আপনার সাথীদের সাথে হাউজে কাওসারের পাশে সাক্ষাৎ করবেন।

এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন আর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। তোমরা সেসব সাথীর কথা বলছো, যারা পৃথিবীতে কোনো প্রতিদান পায়নি। আখিরাতে তাঁরা অবশ্যই নিজেদের কর্মের প্রতিদান পাবে। কিন্তু আমরা পরে রয়েছি এবং দুনিয়ার নিয়ামতের অংশ এত পেয়েছি যে, ভয় হয় তা আমাদের আমলের সওয়াব হিসেবেই হিসাব না হয়ে যায়।

ইন্তিকালের কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর সামনে কাফন আনা হলো, তিনি কাফন দেখে অতীতে মুসলিমদের দুরাবস্থার কথা স্মরণ করে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন- এতো সম্পূর্ণ কাফন! আফসোস! হামাযা (রা.)-কে একটি ছোট ধরনের কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিলো। যেটি তাঁর সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করার মতো ছিল না। তাঁর পা আবৃত করলে

মাথা বের হয়ে যেতো আর মাথা আবৃত করলে পা বের হয়ে যেতো। পরিশেষে আমরা তাঁর পা ইযখির নামক ঘাস দিয়ে ঢেকে কাফনের কাজ সম্পন্ন করেছি।

মৃত্যু ঃ ৩৭ হিজরীতে খাব্বাব (রা.) ইন্তিকাল করেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রথম কুফায় দাফন করা হয়।

খলীফা আলী (রা.) এর মন্তব্য ঃ আলী (রা.)র চোখে কুফা শহরের বাইরে সাতটি কবর পড়লো। তিনি সাথীদের কাছে জানতে চাইলেন, এসব কোন লোকজনের কবর! এখানে তো কোনো কবর ছিলো না! তাঁকে বলা হলো, এই প্রথম কবরটি খাব্বাব বিন আরাতের। তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী সর্বপ্রথম তাঁকে এখানে দাফন করা হয়। অবশিষ্ট কবরগুলো অন্যদের। তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদেরকে এখানে দাফন করেছে।

এ কথা শোনার সাথে সাথে আলী (রা.)র চোখ দু'টো অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। তিনি তাঁর কবরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন, খাব্বাবের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি স্বেচ্ছায় ও আনন্দ চিত্তে আল্লাহর দ্বীন কবুল করেছিলেন এবং নিজের ইচ্ছাতেই হিজরত করেছিলেন। সারাটি জীবন তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে কাটিয়েছেন এবং ইসলামের জন্য অকল্পনীয় বিপদ সহ্য করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সৎ লোকদের আমল নষ্ট করেন না।

খাব্বাব ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ইতিহাসের পাতায় নিজের দৃঢ় সঙ্কল্প ও অবিচল-অটলতার এমন তুলনাহীন চিহ্ন এঁকেছেন যে, প্রত্যেক যুগের ঈমানদারদের জন্য তা চেতনার মশাল হয়ে রয়েছে। তিনি নিজের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে জেনে বুঝে মুসলিম হন এবং হিজরত করেন।

আম্মার ইবন ইয়াসির

(রাদিআল্লাহু আনহু)

ইসলাম গ্রহণ ও অত্যাচার সহ্য ঃ আম্মার (রা.) ও তার মাতা-পিতা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের শত্রুরা তাঁদের উপরে লোমহর্ষক নির্যাতন করতে থাকে। আরবের মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপরে তাঁদেরকে শাস্তি দেয়া হতো। আঘাতের পর আঘাত করতো পাষন্ডের দল। আঘাত সহ্য করতে না পেরে তিনি অনেক সময় জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। তাঁর পাশ দিয়ে নাবী কারীম ﷺ যাবার সময় তাঁকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ ও জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন।

ইসলামের জন্য পিতার ত্যাগ ঃ তাঁর পিতা ইয়াসির (রা.)-কে ইসলামের শত্রুরা ধরে দু'পায়ে দু'টো রশি বেঁধে তা দু'টো উটের পায়ে বেঁধে দেয়া হলো। এরপর উট দু'টিকে দুই দিকে যাবার জন্য আঘাত করা হলো। উট দু'টো দুই দিকে দৌড় দেয়ার পরে ইয়াসিরের দেহ ছিঁড়ে দুই ভাগ হয়ে গেলো এবং তিনি তৎক্ষণাত শাহাদাতবরণ করলেন।

ইসলামের জন্য মাতার ত্যাগ ঃ আম্মারকেও প্রহার করতে করতে অচেতন করে ফেলা হতো। তাঁর গর্ভধারিণী মা সুমাইয়া (রা.) দেখতেন- কিভাবে তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানকে প্রহার করা হচ্ছে। সন্তানকে প্রহার করা হচ্ছে আর তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। তাঁর মুখে কালিমার ঘোষণা শুনে নরপশু আবু জাহিল ক্রুদ্ধ হয়ে সুমাইয়াকে বর্শা বিদ্ধ করে হত্যা করলো। নারীদের মধ্যে সুমাইয়া (রা.)-ই সর্বপ্রথম শাহাদাতবরণ করেন।

ইসলামের সেবা ঃ আম্মার (রা.) ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ- মসজিদে কুবা নির্মাণে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে ভূমিকা রাখেন। কুবা মসজিদ নির্মাণের জন্য আম্মারই পাথর একত্রিত করেছিলেন এবং মসজিদের মূল নির্মাণ কাজও তিনিই করেছিলেন। মদীনার মসজিদে নববী নির্মাণেও তিনি বিরাট ভূমিকা রাখেন।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও মৃত্যু ঃ তিনি যখন শাহাদাতবরণ করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯০ বছরের অধিক। কেউ বলেছেন ৯৪ বছর। নাবী কারীম ﷺ তাঁর শাহাদাতের ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিলেন, তোমার জীবনের সবশেষ চুমুক তুমি যা পান করবে তা হবে দুধ।

বয়স বেশীর কারণে মহাসত্যের জন্য লড়াই করতে গিয়ে যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে কেউ-ই দুর্বল দেখেনি। তিনি অসীম সাহসিকতার ও বলিষ্ঠতার সাথে যুদ্ধের ময়দানে যুবক যোদ্ধার ন্যায় ভূমিকা পালন করেছেন। সেদিন যুদ্ধের ময়দানে প্রচন্ড যুদ্ধ হচ্ছিলো। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। আম্মার (রা.) প্রবল পিপাসা অনুভব করলেন। সম্মুখে পেলেন দুধ, তাই তিনি পান করলেন। এরপর তাঁর মনে পড়লো আল্লাহর রসূলের ভবিষ্যৎ বাণীর কথা।

তিনি অনুভব করলেন, আজই তাঁর জীবনের শেষ দিন এবং এখুনি তিনি শাহাদাতাবরণ করবেন। তিনি নিজের মুখেই তাঁর সর্ম্পকে আল্লাহর রসূলের বলা কথা বললেন, আল্লাহর রসূল বলেছেন, হে আম্মার! সবশেষে তুমি যা পান করবে তা হবে দুধ।

এ কথা বলতে বলতে তিনি শত্রু বাহিনীর দিকে প্রচন্ড বেগে ধাবিত হলেন। সম্মুখে হাশিম (রা.)-কে যুদ্ধের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, হে হাশিম! সম্মুখে অগ্রসর হও! জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে এবং মৃত্যু নেজার (এক ধরনের অস্ত্র) কিনারায় অবস্থান করে। জান্নাতের দরজা খোলা হয়েছে। আজ আমি বন্ধুদের সাথে মিলিত হবো। আজ আমি আমার বন্ধু মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর দলের সাথে মিলিত হবো। এ কথা বলতে বলতে তিনি শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি যেদিকেই যেতেন, সেদিকের শত্রুসৈন্যের রণবুহ্য ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। যুদ্ধের ময়দানে তিনি এক সময় শাহাদাত বরণ করে এই পৃথিবী ত্যাগ করলেন।

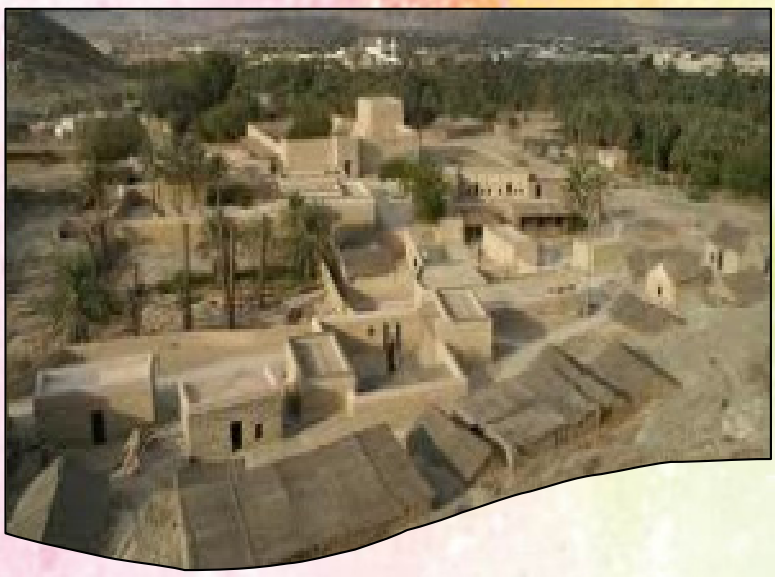

আবু যার আল গিফারী

(রাদিআল্লাহু আনহু)

পরিচয় ঃ আবু যার আল গিফারী (রা.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। আলিম হিসেবেও তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আলী (রা.) বলেন, আবুযর এমন গভীর বিদ্যা অর্জন করেছিলেন যে, যা অনেক লোকই আয়ত্ব করতে অক্ষম। তিনি তাঁর গভীর পান্ডিত্য কখনও কারো কাছে প্রদর্শন করতেন না, তিনি নিজের জ্ঞানের আলো বিনয় এবং নম্রতার আবরণ দিয়ে সর্বদাই ঢেকে রাখতেন।

নাবীর বিষয়ে তথ্য অর্জন ঃ তাঁর কাছে নাবী কারীম ﷺ -এর নবুয়াত প্রাপ্তির সংবাদ পৌঁছলে তিনি তার ভাইকে মক্কায় পাঠালেন। যিনি নবুয়াতের দাবী করছেন, যার কাছে ওহি আসে এবং যিনি আসমানের খবর পান, তিনি কেমন লোক, তার চরিত্র কেমন, তিনি কী কী কথা বলেন। তাঁর আচার ব্যবহার কেমন, তা জানার জন্য তাঁর ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন।

তাঁর ভাই মক্কা থেকে ফিরে গিয়ে আবু যারকে বললেন, 'আমি লোকটিকে সৎকথা বলতে, সদাচার করতে এবং পবিত্রতা অর্জন করতে মানুষকে আদেশ দিতে শুনেছি। আমি তাঁর এমন একটি কথা শুনেছি যা কোন ভবিষ্যদ্বাণীও নয় বা কোন কবির বাক্যও নয়।'

মক্কায় গমন ঃ ভাইয়ের কথায় আবু যারের মন শান্ত হল না। নিজে সব কিছু জানার জন্য তিনি মক্কা রওয়ানা হলেন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে সোজা কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি নাবী কারীম ﷺ-কে চিনতে পারলেন না, অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করাও সমীচীন মনে করলেন না।

আলী (রা.) এর সাথে পরিচয় ঃ সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি ঐ অবস্থায়ই থাকলেন। সন্ধ্যার পর আলী (রা.) দেখলেন যে, একজন বিদেশী মুসাফির মসজিদে অবস্থান করছেন। মুসাফিরদের তত্ত্বাবধান করার ভার তাঁর উপর ছিল, কাজেই তিনি আবু যারকে ডেকে এনে নিজের বাড়ীতে খাওয়ালেন এবং রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

তিনি খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লেন নিজের পরিচয় এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্য প্রকাশ করলেন না। সকালে উঠে তিনি আবার মসজিদে চলে গেলেন এবং সমস্ত দিন সেখানে রইলেন। সেদিনও তিনি আল্লাহর নাবীকে নিজেও চিনতে পারলেন না বা কারো কাছে জিজ্ঞেসও করলেন না। সন্ধ্যার পর আলী (রা.) তাঁকে আবার নিজের বাড়ীতে নিয়ে যথারীতি অতিথি আপ্যায়ন করলেন; মুসাফির আজও নিজের পরিচয় গোপন রাখলেন এবং আলী (রা.)ও তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না।

নাবীর সন্ধানে ঃ ভোরে উঠে আবু যার পুনরায় মসজিদে চলে গেলেন, আজও তিনি নাবী কারীম ﷺ -কে চিনতে পারলেন না এবং সেদিনও কাউকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলেন না। আল্লাহর নাবীর সাথে মেলামেশা করা বা তাঁর সান্নিধ্য বা সাহচর্য সন্ধান করা সে সময় বিপজ্জনক ছিল, কারণ তাঁর সম্পর্কে জেনে কেউ যদি ইসলাম কবুল করে, সে জন্য কাফিররা মক্কায় নতুন এসেছে এমন লোকসহ সকলের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখতো। ইসলামের প্রতি বা নাবী কারীম ﷺ -এর প্রতি কারও বিন্দুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ পেলেই তার আর রক্ষা ছিল না; ইসলাম বিরোধিদের অত্যাচার ও নির্যাতনে ইসলামের প্রতি আসক্ত লোকটিকে একেবারে জর্জরিত করে ফেলতো। আবু যার আল গিফারী (রা.) এ কারণেই নিজের পরিচয় গোপন করেছিলেন।

আলী (রা.) কে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত ঃ তৃতীয় দিনেও তাই ঘটলো, কিন্তু আলী (রা.) মুসাফিরকে আহারাদি করিয়ে শোবার পূর্বে তাঁকে মক্কায় আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন। আবু যার (রা.) আলী (রা.)-কে প্রথমে সঠিক সংবাদ বলার জন্য শপথ করিয়ে তারপর নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

আলী (রা.) তার কথা শুনে বললেন, 'তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল ﷺ। কাল সকালে আমি যখন মসজিদে রওয়ানা হবো তখন আপনিও আমাকে অনুসরণ করবেন। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে যে আপনি আমার সঙ্গী। রাস্তায় যদি কোন শত্রু সামনে পড়ে, তাহলে আমি কোনো কারণ দেখিয়ে বা জুতার ফিতা বাঁধতে বসে পড়ব, আপনি তখন আমার জন্য অপেক্ষা না করে সোজা চলতে থাকবেন এবং এমনি করে বুঝিয়ে দিবেন যে আমি আপনার সঙ্গী নই বা আপনার ও আমার উদ্দেশ্য এক নয়।'

ইসলাম গ্রহণ ঃ ভোরে উঠে আলী (রা.) মসজিদের দিকে যাত্রা করলেন, আবু যার আল গিফারী (রা.)ও তাঁর পিছে পিছে যেতে লাগলেন। যথাসময়ে নাবী কারীম ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কথাবার্তা মনযোগ দিয়ে শুনলেন। সত্যান্বেষী প্রাণ সত্যের আহবান শুনে কখনও স্থির থাকতে পারে না। আবু যার (রা.)ও কথা শুনার পর এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সেখানে বসেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

সত্য প্রকাশ ও নির্যাতনের শিকার ঃ অত্যাচার ও নির্যাতনের আশঙ্কা করে নাবী কারীম ﷺ আবু যার (রা.)-কে বললেন, 'তুমি ইসলাম গ্রহণের কথা এখন গোপন করে রেখো এবং নিরবে বাড়ী চলে যাও। মুসলিমদের আরও একটু প্রতিপত্তি এবং শক্তি সামর্থ হলেই চলে এসো।' আবু যার (রা.) বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আমি সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তাওহীদের মহাবাণী কাফিরদের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবো।'

এ কথা বলেই তিনি তৎক্ষণাৎ কা'বা গৃহে প্রবেশ করে উচ্চস্বরে তাওহীদের কালেমা পাঠ করলেন। আর যায় কোথায়! চারদিক থেকে কাফিররা ভিমরুলের মত উড়ে এসে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আঘাতে আঘাতে আবু যার (রা.)-র শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। নিষ্ঠুর-নির্মম আঘাতে তিনি মুমূর্ষ হয়ে পড়লেন। ঐ সময় নাবী কারীম ﷺ -এর চাচা আব্বাস, যদিও তিনি তখন পর্যন্ত মুসলিম হননি তবুও মুমূর্ষু আবু যারকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলেন এবং আঘাতকারী লোকদের বললেন, কি সর্বনাশ! এ যে গিফারী গোত্রের লোক, শাম দেশের রাস্তাতেই যে তাদের বাসস্থান, এর মৃত্যু হলে যে ঐ দেশের সাথে তোমাদের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যই বন্ধ হয়ে যাবে। একে মেরে ফেললে তোমাদের সেখানে যাওয়ার আর কি কোন পথ থাকবে?

তাঁর কথায় ইসলামের দুশমনরা কিছুটা যেনো চমকে উঠলো এবং সেদিনের মতো তারা আবু যারের উপর অত্যাচার বন্ধ করলো। পরের দিনও আবু যার (রা.) মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে ঠিক পূর্বের ন্যায়ই কালেমা শাহাদাৎ পাঠ করলেন, সে দিনও কাফিররা তাঁকে চরম আঘাত করে মরণাপ্ন করে তুললো। এবারেও আব্বাস ইসলামের শত্রুদেরকে বুঝিয়ে আবু যার (রা.)-কে নির্যাতন থেকে রক্ষা করলেন।

আল্লাহভীতি ঃ এটাই সত্যিকার ঈমানদারের পরিচয়, তাকওয়ার পরিচয়। ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই, আল্লাহর প্রেমিক, আল্লাহর পবিত্র নামের গুণকীর্তন ও পৃথিবীর বুকে তা প্রতিষ্ঠিত করতে, সর্বশ্রেণীর মানুষের সম্মুখে তা প্রচার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন না। এ কারণেই আবু যার (রা.) নিষেধ সত্ত্বেও দ্বিধাহীন চিত্তে কাফিরদের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা উচ্চারণ করতে এতটুকুও শঙ্কিত হননি। আবু যার ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এ কথা কাফিররা জানলে তাঁর উপর নির্যাতন চালাবে, এ কারণে নাবী কারীম ﷺ তাঁকে

নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ঈমানের আগুন এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো এবং ঈমানের যে স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন, তা আর গোপন রাখতে পারেননি। অন্যকেও ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য আহবান করেছিলেন।

তিনি যখন কালিমা পাঠ করছেন, সেই কালেমা তাঁর মধ্যে ঈমানের যে শক্তিদান করেছে, সেই শক্তিতেই তিনি শত্রুদের সম্মুখে মহাসত্যের ঘোষণা দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কলিমা শাহাদাৎ এক অদ্ভুত, ঐকান্তিকভাবে তা একবার পাঠ করলে মানুষের মনে যে শক্তির বন্যা আসে, তার সম্মুখে জগতের অত্যাচার আর নির্মম নির্যাতন তৃণ-খণ্ডের মত ভেসে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিমরা বিজয়ী হয়েছিলো ঈমানী শক্তির কারণেই, তাকওয়ার গভীরতার কারণেই। ঈমানী শক্তির কাছে সংখ্যা গরিষ্ঠ কাফিররা মুষ্টিমেয় সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। যে ব্যক্তি নিজের সবকিছু মহান আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, সেই ব্যক্তি পৃথিবীর কোনো শক্তির সম্মুখে মাথানত করতে পারে না। এই ধরনের মুসলিমদের একটি দলের সম্মুখে দুনিয়ার ইসলাম বিরোধী শক্তি মুহূর্তকালের জন্যও টিকে থাকতে পারে না।

মুয়াব্বিজ ও মুয়াজ

(রাদিআল্লাহু আনহু)

কে এই মুয়াব্বিজ ও মুয়াজ ? ইসলামের কঠোর শত্রু এবং মক্কায় অবস্থানের সময় নাবী কারীম ﷺ-কে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছে আবু জাহিল। মদীনায় এ কথা এমনভাবে প্রচারিত হয়েছিল যে, মদীনার একজন মুসলিম শিশুও তার নাম জানতো। মদীনার আনসারদের দুই কিশোর সন্তান, মুয়াব্বিজ ও মুয়াজ (রা.), তাঁরা ছিলেন আপন দুই ভাই। এই দুই ভাই প্রতীজ্ঞা করেছিল, রসূল ﷺ-কে যে ব্যক্তি বেশী কষ্ট দিয়েছে, সেই আবু জাহিলকে তাঁরা হত্যা করবে আর না হয় তাঁরা শাহাদাতবরণ করবে।

বদরের যুদ্ধের ঘটনা ঃ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বলেন, 'আমি এক সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার দুই পাশে ছিল কিশোর দু'টি ছেলে। আমার কেমন যেন বিব্রত বোধ হচ্ছিল, আমার দুই পাশে দু'টি কিশোর ছেলে, বয়স্ক বা কোন বীর নয়! এক পাশের একজন আমার কানের কাছে মুখ এনে জানতে চাইলো, আবু জাহিল লোকটি কে? অপর পাশের কিশোরটিও আবু জাহিলের পরিচয় জানতে চাইলো। তখন আমার জড়তার ভাব কেটে গেল। আমার মনে হলো, আমি দু'জন বীরের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছি।'

আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, 'আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আবু জালিকে তোমাদের কী প্রয়োজন?' তাঁরা জানালো, 'আমরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছি, আবু জালিকে হত্যা করবো অথবা শাহাদাতবরণ করবো।'

এরপর আব্দুর রহমান (রা.) তাদের দুই ভাইকে ইশারা দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আবু জালিকে। আবু জাহিলকে দেখার সাথে সাথে দুই ভাই তীর বেগে ছুটে গেল তার কাছে। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লো আল্লাহর শত্রুর উপরে। আবু জাহিল মাটিতে পড়ে গেল। তাকে রক্ষার জন্য তার ছেলে দ্রুত এগিয়ে এসে তরবারীর আঘাত করলো। মুয়াজ (রা.)-র বাম হাতটি এমনভাবে কেটে গেল।

বদরের প্রান্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিমদেরকে বিজয়দান করার পরে নাবী কারীম ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'এমন কেউ আছে কি, যে ব্যক্তি আবু জাহিলের পরিণতি দেখে আসবে?

খালিদ বিন ওয়ালিদ

(রাদিআল্লাহু আনহু)

পরিচয় ঃ কুরাইশদের মধ্যে সম্মানিত গোষ্ঠীর সন্তান ছিলেন খালিদ (রা.) । তাঁর গোটা বংশই ছিল আরবের সেনা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত । অর্থাৎ তিনি এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যারা সবাই সামরিক বাহিনীর লোক ছিল । তাঁর রক্তের মধ্যে মিশ্রিত ছিল সামরিক বাহিনীর যুদ্ধের কৌশল ।

ইসলাম গ্রহণ ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন । আমর ইবনুল আ'স (রা.) সম্পর্কে কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি হাবশাতেই বাদশাহর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । আবার কোন বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি হাবশা থেকে মদীনায় রসূলের কাছে যাচ্ছিলেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য । পথে তিনি মদীনা যাত্রী একদল লোককে দেখতে পেলেন । তাদের মধ্যে খালিদ (রা.) ছিলেন । তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে খালিদ! কোন দিকে যাচ্ছো?'

তিনি কোন ধরণের জড়তা ব্যতীতই বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল । আর কতদিন এভাবে থাকবো । চলো যাই তাঁর কাছে, ইসলাম গ্রহণ করি ।' তারপর তাঁরা মদীনায় আল্লাহর নাবী ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন । খালিদ (রা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পরে আল্লাহর নাবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন, 'আমি তোমার ভেতরে যে যোগ্যতা দেখতাম, তাতে আমি আশাবাদী ছিলাম তুমি একদিন কল্যাণ লাভ করবে ।'

অতীত ভুলের জন্য অনুশোচনা ঃ খালিদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাঁর মধ্যে অতীত ভুলের জন্য অনুশোচনা জাগলো । তিনি আল্লাহর নাবী ﷺ -এর কাছে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে আমি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যে গোনাহ করেছি, এ কারণে আমার জন্য দু'আ করুন ।' নাবী কারীম ﷺ বললেন, ইসলাম অতীতের সমস্ত পাপ মুছে দেয় ।'

খালিদ (রা.) বললেন, 'আপনার এই কথার উপরে আমি বাইয়াত গ্রহণ করলাম । রসূল ﷺ আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, 'আমার আল্লাহ! খালিদ তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যে পাপ করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও!'

জেনারেল এর দায়িত্ব ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশদের জেনারেল, ইসলাম গ্রহণের পরে মুসলিম হিসেবে তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধেই ঘটনাচক্রে তাঁকেই জেনারেলের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল । মুসলিম হিসেবে তাঁর প্রথম যুদ্ধ ছিল মুতার যুদ্ধ । এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র দুই হাজার আর রোমান বাহিনীর সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ । নাবী কারীম ﷺ এই যুদ্ধে পরপর তিনজনের নাম সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন । যায়িদ, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) । এই তিনজনের কথা রসূল ﷺ এভাবে বলেছিলেন যে, প্রথমজন শাহাদত বরণ করলে দ্বিতীয় জন সেনাপতি হবে । তিনিও শাহাদতবরণ করলে তৃতীয়জন সেনাপতি হবে । তিনিও শাহাদতবরণ করলে মুসলিমরা যাকে ইচ্ছা সেনাপতি নিয়োগ করবে ।

মুতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতির অধীনে খালিদ জেনারেলের সমস্ত অহংকার বিসর্জন দিয়ে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন । পরপর তিনজনই যখন শাহাদতবরণ করলেন, তখন সাবিত ইবনে আকরাম (রা.) যুদ্ধের পতাকা উঠিয়ে নিলেন- যেন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে কোন ধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় ।

পতাকা হাতে তিনি খালিদ (রা.)-র কাছে এসে বললেন, 'হে খালিদ! এই পতাকা তুমি ধরো।' দুই লক্ষের বিরুদ্ধে মাত্র দুই হাজার সৈন্য এবং এই দুই হাজারের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বেশী। বদর, ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম এই বাহিনীতে শামিল রয়েছেন। তাদের উপরে নও মুসলিম খালিদের নেতৃত্ব দেবার যে কোন অধিকার নেই এ কথা খালিদের থেকে আর কে ভালো বুঝতো! তিনি আপত্তি জানিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বললেন, 'অসম্ভব! আমি এ পতাকা গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। আপনি বদর-ওহুদে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনিই এই পতাকার যোগ্যতম ব্যক্তি।'

সাবিত (রা.) বললেন, 'আমি এই পতাকা তোমার জন্যই উঠিয়ে এনেছি। আমার তুলনায় তোমার মধ্যে সামরিক যোগ্যতা অনেক বেশী। তুমি এ পতাকা ধরো।' এবার সাবিত (রা.) মুসলিম বাহিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কি খালিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে রাজি আছো?' সমবেত বাহিনী সম্মতি জানিয়ে বলেছিল, 'অবশ্যই আমরা রাজি আছি।'

খালিদ (রা.) জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে দুই হাজার মুসলিম বাহিনী দুই লক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। তিনি বলেন, 'সেদিনের যুদ্ধে আমার হাতে সাতটি তরবারী ভেঙ্গেছিল। সর্বশেষে একটি ইয়েমেনী তরবারী টিকে ছিল।'

আল্লাহর তরবারী উপাধী ঃ আল্লাহর নাবী খালিদের উপাধি দান করেছিলেন, সাইফুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেমন ছিলেন ইসলামের কট্টর শত্রু, তেমনি ইসলাম গ্রহণ করার পরে হয়েছিলেন ইসলামের পরম বন্ধু।